Vol. 31 | No. 2 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ও পরিচায়ন পদ্ধতি

Volume	31
Issue	2
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কল্পনা ভৌমিক
Published online	February 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i2.6
Pages	189-226
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ও পরিচ…

Check for updates

কল্পনা ভৌমিক

১.০. ভূমিকা

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির জীর্ণবক্ষে আমাদের যে সাহিত্যকৃতি, অতীত-ঐতিহ্য ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছে, যার সজীবতার মধ্যে আমাদের 'বর্তমান' খুঁজে পেতে পারে তার ঋদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার বহুল জীবনীশক্তি, তাকে জীবন্ত করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস এতদিন দুর্লক্ষ্য ছিল। দীর্ঘদিনের সীমাহীন অবহেলা, ঔদাসীন্য, অনাদর আর প্রযত্নের অভাবে ইতোমধ্যে অনেক পাণ্ডুলিপি বিলীন হয়ে গেছে; অবশিষ্টাংশও বিলুপ্তির পথে। তবে সাম্প্রতিক কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অমূল্য সম্পদ রক্ষাকল্পে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য—বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে-সকল পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে তাদের পরিচায়ন করা এবং মাইক্রোফিল্ম পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখা। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা আনুমানিক ৬০ হাজারের ঊর্ধ্বে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিগুলো নিতান্ত অবহেলা ও অযত্নের এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অবক্ষয়ের শিকার হয়ে আছে। এদের অধিকাংশই অদ্যাবধি অপরিচায়িত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে—যা আমাদের জাতীয় জীবনে কখনোই গৌরবের নয়। এর পশ্চাতে কারণ অনেক, তন্মধ্যে দু'টি কারণ হলো—এসব প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মূল্য সম্পর্কে অনবগতি ও পাণ্ডুলিপি গবেষকের অভাব। অনেকের ধারণা—এ সব জীর্ণ পত্র ঘেঁটে কি হবে? কিন্তু মুক্তো পেতে হলে কিছু ধুলো-বালিতো শরীরে মাখতেই হবে। আর এ জন্যেই দরকার যথেষ্ট সংখ্যক গবেষকের। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে বাংলাদেশে এ ধরনের পাণ্ডুলিপি গবেষকের কেবল অভাবই নয়, পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে এমন লোকের সংখ্যাও অপ্রতুল।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রথমে পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা রাখতে হবে, পরে পরিচায়ন পদ্ধতির সাহায্যে চালাতে হবে গবেষণার কাজ। পাণ্ডুলিপি কি, এর আকার কিরূপ, রং কেমন, কিসের উপরই বা লেখা হত, কিসের দ্বারা লেখা হত, কোথায় কিভাবে লেখা হত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়। একটা পাণ্ডুলিপির পত্রের সঙ্গে অন্য একটা পাণ্ডুলিপির পত্র মিশে গেলে তাদের পৃথকীকরণে যখন জটিলতার সৃষ্টি হয়, তখন পাণ্ডুলিপির আকার বা পরিমাপ এই পৃথকীকরণে অনেকটা সহায়তা করে। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন উপাদান (অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি যার উপর লেখা হত, যেমন—ভূর্জ-পত্র, তালপত্র, তুলটকাগজ ইত্যাদি); কালি, লেখার আকৃতি, লেখার রীতি প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির লেখক এবং তার কাল নিরূপণে সহায়তা করে। পাণ্ডুলিপি কোথায় কিভাবে কি লেখা হত সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে তা-ও পাণ্ডুলিপি পরিচায়নে সহযোগী হয়। কিন্তু আমার জানা মতে পাণ্ডুলিপির এই সাধারণ পরিচিতি ও পরিচায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি যার দ্বারা পাণ্ডু-লিপির নতুন কোন গবেষক এ-বিষয়ে উপকৃত হতে পারেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এতদ্বিষয়েই যথাসাধ্য আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.০. পাণ্ডুলিপির আকার

বিধিবদ্ধ কোন নিয়মে পাণ্ডুলিপির আকৃতি কিংবা প্রকৃতি প্রণীত না হওয়ায় এর আকার নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট কোনরূপ রেখার বিন্যাস ঘটানো কখনোই সহজসাধ্য নয়। যুগে যুগে এক শতাব্দ থেকে আর শতাব্দে কালের বিবর্তনে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি, উপকরণের প্রাপ্তি ইত্যাদি ভেদে পাণ্ডুলিপির আকারে-প্রকারে ঘটেছে বিভিন্নতা। কেবল বহুকালের ব্যাপক পরীক্ষা আর গভীর নিরীক্ষার সরণি অতিক্রম করে এ বিষয়ে হয়তো কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আকৃতির দিক থেকে পাণ্ডুলিপিসমূহকে মোটামুটিভাবে বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র এ তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। বৃহৎ আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ সাধারণতঃ ৬১ × ১০ সেন্টিমিটার[১] থেকে ৫২ × ১৩.৫ সেন্টিমিটার[২], মধ্যম আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ ৪১ × ১২

সেন্টিমিটার[৩] থেকে ৩০ × ৩.৫ সেন্টিমিটার[৪] এবং ক্ষুদ্র আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ ৬.৫ × ২.৫ সেন্টিমিটার[৫] থেকে ১০.৫ × ৯.৫ সেন্টিমিটার[৬]-এর মধ্যে হয়ে থাকে। পাণ্ডুলিপির আকারের এই তারতম্যের কারণ কিন্তু একাধিক। এ কারণগুলিকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে :

২.১. লেখার উপকরণ বা উপাদান ভেদে ঘটেছে পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য। যেমন—তালপত্র, কদলীপত্র (কলাপাতা), তেরেটপত্র ও ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণেই তাল-পত্রের প্রশস্ততা কম হওয়ায় পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে এর দৈর্ঘ্যকেও রাখতে হয়েছে স্বল্প। কারণ তালপত্রে প্রণীত পাণ্ডুলিপি বেশী লম্বা হলে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকে বেশী। তাই বুদ্ধি ও রুচির ভিন্নতায় এর আকারও হয়েছে বিভিন্ন। কদলীপত্রে ও ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপির আকৃতি সর্বাধিক ক্ষুদ্র। কদলীপত্র যেমন পাতলা তেমন এর দৈর্ঘও কম। এজন্য ইচ্ছে করলেও লেখার এই উপাদানটিকে বড় করা সম্ভব হয়নি। তেরেট-পত্র তালপত্রের প্রায় সদৃশ হলেও তালপত্র থেকে তেরেট-পত্রের প্রশস্ততা একটু বেশী। ফলে তেরেট-পত্রে প্রণীত পাণ্ডুলিপির আকারও হয়েছে কিছুটা প্রশস্ত।

বিভিন্ন গাছের বাকল এবং সুপারী গাছের খোলে লেখা পাণ্ডুলিপি উপরিউক্ত বিভিন্ন পত্র থেকে সাধারণতঃ বৃহৎ আকৃতির। এগুলি প্রাকৃতিক কারণেই বৃহৎ ও সুদৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী। ফলে এই পাণ্ডুলিপির আকৃতিও হয়েছে কিছুটা বৃহৎ এবং প্রশস্ত।

তবে বৃহৎ ও অধিকতর প্রশস্ত আকৃতির যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তার প্রায় সবই লেখা তুলট কাগজে। এর কারণটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন উপাদানের মত তুলট কাগজ কোন প্রকৃতি নির্ভর উপাদান নয়। নানা প্রকার দেশীয় উপাদানের সাহায্যে এগুলি তৈরী হত মানুষের হাতেই। যে কারণে সৃষ্টিশীল মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী এগুলি বড় ছোট করতে পেরেছে। তাই বলা চলে যে আকৃতিগত দিক থেকে বিভিন্ন পত্রে প্রণীত পাণ্ডুলিপি থেকে গাছের বাকলে প্রণীত পাণ্ডুলিপি কিছুটা বৃহৎ এবং বৃহত্তর তুলট কাগজের পাণ্ডুলিপি। এ আলোচনায় উদাহরণে প্রতিফলিত নিয়মের ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে মোটামুটিভাবে এরূপ একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

২.২. বিষয় ভেদেও পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য ঘটেছে। একই উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও কেবল বিষয়ের বিভিন্নতায় পাণ্ডুলিপির আকারের যে তারতম্য হত তার দৃষ্টান্তও অপ্রতুল নয়। একই তুলট কাগজে কোন সুদীর্ঘ বিষয় অবলম্বনে তৈরী হয়েছে বৃহদাকৃতির পাণ্ডুলিপি। আবার কোন ক্ষুদ্র বা সাধারণ বিষয় অবলম্বনে লিখিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির পাণ্ডুলিপি। যেমন—রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি বিষয় সংবলিত পাণ্ডুলিপি বৃহদায়তন বিশিষ্ট। পরিমাপ ৫২ × ১৩.৫ সেন্টিমিটার[৭]। অপরদিকে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ ইত্যাদি বিষয় সংবলিত পাণ্ডুলিপি ক্ষুদ্র অবয়বী, পরিমাপ ১০.৫ × ৯.৫ সেন্টিমিটার[৮]। বিষয় ভেদে পাণ্ডুলিপির আকারের এই তারতম্য সব উপকরণেই কিছু না কিছু পরিদৃষ্ট, তবে তুলট কাগজের ক্ষেত্রে এর কিছুটা আধিক্য। এর কারণ হলো, তুলট কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশী এবং প্রাচীন সাহিত্যের সব ধরনের বিষয়ই লেখা হয়েছে এই উপকরণে। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় হলো তালপত্রের পাণ্ডুলিপি, এখানে উল্লেখ্য, গবেষণা-লব্ধ তথ্যে দেখা যায়, ১৭ শতকের পরবর্তী পাণ্ডুলিপিগুলি সাধারণতঃ বৃহদাকৃতির হয়েছে। এর কারণ নির্দিষ্টভাবে বলা সহজসাধ্য না হলেও এটুকু বলা যায় যে লিপিকরদের রুচি ও মানসিকতার পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে অনেকখানি ক্রিয়াশীল।

২.৩. লেখার আকৃতি ভেদেও পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য পরিলক্ষিত। ক্ষুদ্র আকৃতির অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপির আকার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর ; অপরদিকে লেখার অক্ষর বড় হলে পাণ্ডুলিপির আকারও হয়েছে বড়। অর্থাৎ বৃহৎ আকারের যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার হাতের লেখার অক্ষরগুলিও সাধারণতঃ বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট। একই শতকের বিভিন্ন লেখার মধ্যেও পাণ্ডুলিপির আকারের এই পার্থক্য পরিদৃষ্ট। উদাহরণ হিসেবে পনের শতকের তিনটি পাণ্ডুলিপির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—'মহাভারত'[৯]। পুথিটিতে লিখিত অক্ষরগুলি এবং এর বিষয় বৃহৎ হওয়ায় পাণ্ডুলিপির আকারও হয়েছে বৃহৎ। 'সারদাতিলক'[১০] পুথিটির বিষয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হওয়ায় লিখিত অক্ষরগুলিও ক্ষুদ্র এবং এ কারণে এর আকৃতিও ক্ষুদ্র। এবং উল্লেখ্য অন্য আর একটি পাণ্ডুলিপি 'অমরকোষ'[১১] যার অক্ষর, বিষয় এবং আকার খুবই ক্ষুদ্র। সুতরাং বলা চলে যে বিষয় এবং অক্ষর অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য ঘটেছে।

এতক্ষণ পুরান, মহাভারত, রামায়ণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির আকৃতি আলোচিত হল। এবার বিভিন্ন দলিলপত্রের আকার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। এটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত যে সেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দলিলের শ্রেণীতে রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য। প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপির পাতা আমরা যত পেছনের দিকে ওলটাতে থাকি ততই দেখা যায় এর আকৃতি হয়েছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, এবং একথা প্রযোজ্য দলিল পত্রের ক্ষেত্রেও। অবশ্য আমার এ বক্তব্যের ভিত্তি কেবল জ্ঞাত তথ্য, সুপ্রাচীন কালের অনেক নিদর্শন এখনও আমার অপরিজ্ঞাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে গাছের বাকলে লিখিত সতের শতকের যে দলিল পাওয়া গেছে তা আকারে ক্ষুদ্র। সতের শতকের সময় দলিল গাছের বাকল থেকে তুলট কাগজেই বেশী লেখা হত বলে ধারণা করা যায়। তবে দলিলের আকার হত ক্ষুদ্র। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ও বেশীর ভাগ দলিল তুলট কাগজে লেখা হত এবং তা আকারেও হয়েছে ক্ষুদ্র। আওরঙ্গজেবের সময়ের একটি দলিলের আকার ১৬×১৫ সেন্টিমিটার[১২]। এর পরবর্তীকালে তুলট কাগজের দলিল ক্রমে বৃহদাকৃতির হতে থাকে। এবং এর আকার ৪০×২০ সেন্টিমিটারে এসে স্থিতি লাভ করে। ১৯ শতকে বৃটিশ আমলে লেখা দলিলপত্র তুলটকাগজ ছেড়ে মিলকাগজে রূপ পরিগ্রহ করে, যা বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত।

৩.০. পাণ্ডুলিপির লিখন উপকরণ

৩.১. ভারতবর্ষে লিখন পদ্ধতির ক্রম বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সীলমোহর, তাম্রফলক, ধাতবপাত, পাথর, পশুচর্ম, কাষ্ঠফলক, ইট, কার্পাসকাপড় প্রভৃতি উপকরণে লিখন প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলি দেখা যায়, তালপত্র, ভূর্জপত্র, তুলটকাগজ, গাছের বাকল, তেরেট পত্র, কদলীপত্র, হাতে তৈরী পাতলা কাগজ প্রভৃতি উপাদানে প্রস্তুত। পরবর্তী সময়ের এই সমস্ত পাণ্ডুলিপিই আমার আলোচনার বিষয়। এ নিয়ে চলছে সমগ্র বিশ্বে বিস্তর সমালোচনা ও গবেষণা।

৩.২. বর্তমান যুগে যেমন যন্ত্রে তৈরী সুন্দর কলম দিয়ে আমরা লিখি, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণে পাণ্ডুলিপির লেখপত্র, লেখনী, কালি থেকে শুরু করে সকল উপাদান ও উপকরণ তৈরী হত হাতে। বিভিন্ন দেশীয় উপাদান থেকেই লেখার জন্য প্রস্তুত করা হত প্রয়োজনীয় লেখনী। যেমন বাঁশের কঞ্চি, পাখীর পালক, নল (সর জাতীয়), মোটা ঘাস প্রভৃতি উপাদানের অগ্রভাগ সরু করে কিংবা লোহার পেরেক ঘসে কলম তৈরী করা হত। এসমস্ত কলম দেখতে যেমনই হোক না কেন সেগুলো দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা যে অতীব সৌন্দর্যবর্ধক এবং প্রশংসার্হ এটা অবশ্যই স্বীকার্য। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পত্রে ও ছত্রে দৃষ্টি নন্দন লেখাই বহন করে এর প্রমাণ। লেখনীসমূহের মধ্যে আবার পাখীর পালক দিয়ে লেখা পুথি-গুলিই অধিক আকর্ষণীয় এবং সম্ভবতঃ দীর্ঘস্থায়ীও।

৩.৩. এখন পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত আলোচনায় লেখ্য কালি বিষয়ক বক্তব্যও খুবই প্রাসঙ্গিক। সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হত কালো বর্ণের কালি। তবে লাল এবং তাম্রবর্ণের কালির ব্যবহারও পরিদৃষ্ট। একই সঙ্গে দুই বর্ণের কালির ব্যবহারও ছিল প্রচলিত। অনেক পাণ্ডু-লিপিতে লাল ও কালো কালির ব্যবহার একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন কালে এই দুই কালিতে কিংবা দুই কালির সংমিশ্রণে লেখা বোধহয় একটা বহুল ব্যবহৃত নিয়মে পরিণত হয়েছিল। বিশেষতঃ কালো কালি দিয়ে পংক্তি লিখে লাল কালিতে দেয়া হত বিরাম চিহ্ন। কোন কোন পুথিতে তামাটে কালি দিয়ে চিত্র এঁকে কালো বা লাল কালি দিয়ে মন্ত্র বা শ্লোক লেখা হত। আবার কোন কোন পুথিতে মাঝখানের দুই/এক লাইন বা পংক্তি লাল কালি দিয়ে লিখে বাকীটা লেখা হয়েছে কালো কালিতে। সাধারণতঃ বৈষ্ণবকাব্য এবং তন্ত্র শ্রেণীর পাণ্ডুলিপিতে এই দুই কালির মিশ্রণ অধিক পরিদৃষ্ট। তবে অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতেও দুই কালির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ব্যবহৃত কালি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ পাণ্ডুলিপি গবেষণার ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি লেখার কালি অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দেশীয়

উপাদান দ্বারা নানা প্রকার কালি তৈরী করা হত। উপাদানের গুণাগুণের উপর নির্ভর করত কালির ঘনত্ব বা তরলত্ব এবং তার স্থায়িত্বও। কালি তৈরী করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত শিমুল গাছের ছাল, ছাগলের দুধ, তেল, লোধ্র, লাক্ষা, লোহার গুঁড়া, মাদার কাঠের কয়লা, জবার কুঁড়ি, গাবের ফল, হরিতকী, আমলকী, বাবলা গাছের ছাল, জাঁটির রস, ডালিমের রস (কচি ডালিম), অর্জুন গাছের ছাল প্রভৃতি। কয়েক প্রকার উপকরণের সংমিশ্রণেই তৈরী হত কালি। এর মধ্যে যে কালি তৈরীতে উপাদান হিসাবে লোহার গুঁড়া ব্যবহৃত হত তার রং তুলনামূলকভাবে বেশী উজ্জ্বল হত। এজন্যে সমকালে ঐ কালি ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হত অনেক লেখক, লিপিকর এবং টীকাকার। কিন্তু এই কালির মধ্যেই আবার নিহিত থাকত তার নিষ্প্রভ হওয়ার বীজ। কালিতে মিশ্রিত লৌহ কণিকা ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলে লিপিপত্রকে। ফলে লোহার গুঁড়া মিশ্রিত কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপির স্থায়িত্ব অনেক কমে যায়। এমন কি উক্ত কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপির অংশ ছিন্ন ও চূর্ণ হয়ে ঝরে পড়তে দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুথিশালায় এরূপ কালিতে লেখা বিনষ্ট পুথির বহু নিদর্শন পরিদৃষ্ট। অতএব পুথির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে কালিরও যে-একটা বিশেষ প্রভাব ছিল তা যথার্থরূপেই বলা চলে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে না পড়েও কেবল কালির গুণাগুণেই ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে গেছে পাণ্ডুলিপির অতীতের সাক্ষ্যবাহী দুর্লভ পত্রাবলী। অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, পোকা-মাকড়, আর্দ্রতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা থেকে পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংরক্ষিত হলেও লৌহ মিশ্রিত কালির কারণেই হয়তো আমাদের বিস্মৃত অতীতের পৃষ্ঠাগুলি বিনষ্ট অথবা বিনষ্টপ্রায়। পঞ্চাশ/ষাট বছর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় সংরক্ষিত লৌহমিশ্রিত কালিতে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি ভাল অবস্থায় সংগৃহীত হলেও বর্তমানে তার অধিকাংশই অস্পষ্ট, ক্ষয়িষ্ণু, চূর্ণীভূত, ছিন্ন অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অন্য যে-গুলি এখনও ব্যবহারোপযোগী তার আয়ুও হয়ে এসেছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। পাণ্ডুলিপিগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কাপড়ে সুন্দরভাবে মুড়িয়ে রাখা সত্ত্বেও কেবল কালির কারণেই বিনষ্ট-প্রায় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই বিশেষ নিরীক্ষায় এই কালিতে লেখা মূল্যবান পুথিগুলি বেছে বের করে অব্যবহার্য হওয়ার আগে সে-গুলো অবশ্যই লেমিনেশন

(Lamenation) করা এখনও প্রয়োজন। অন্যথায় যে-গুলির অবস্থা কিছুটা ভাল, সে-গুলি এখনই লেমিনেশন না করলে দিনান্তরে যে মূল্যহীন হয়ে ঝরে পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন কালিতে অন্যতম যে উপাদানটি ছিল তার নাম হরিতকী। উপাদান হিসেবে হরতকী কালিকে প্রদান করেছে দীর্ঘস্থায়িত্ব। এই কালি লৌহ মিশ্রিত কালি অপেক্ষা কিছুটা হালকা এবং মসৃণ। হরিতকী মিশ্রিত কালিতে লেখা ৫০০ (পাঁচশত) বছর পূর্বের পাণ্ডুলিপিও অদ্যাবধি অবিকৃত ও উজ্জ্বল। প্রমাণিত হয়েছে যে, হরিতকী কাগজেরও কোন-রূপ ক্ষতিসাধন করে না। এই কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহকালে যেরূপ ছিল এখনও তার অবস্থা তদ্রূপ।

শিমুল ছালের রস মিশ্রিত কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপিও দীর্ঘস্থায়ী। আমরা যে-কালের কথা বলছি সে-কালে কালি তৈরী ছিল অত্যন্ত ব্যয়-বহুল ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। হয়তো সে-কারণেই তখন স্বল্প ব্যয়ে সহজ উপায়ে অন্য এক প্রকার কালি তৈরীর প্রচলন ছিল। এ প্রকার কালি প্রস্তুত করা হত আতপ চাল মাটির হাড়িতে ভেজে গুঁড়া করে লাউয়ের ডগার রস ও জল মিশ্রিত করে। তবে এই কালি কোন প্রকার দীর্ঘ-স্থায়ী লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত না। হরিতকী বা শিমুলের ছালের তৈরী কালি থেকে এই কালি অনেকটা হালকা বা পাতলা। সাধারণতঃ শিশুশিক্ষার কাজে বা অনুশীলনে ব্যবহৃত হত এই কালি। কলাপাতায় এবং তালপাতায় এই কালির ব্যবহার বেশী ছিল বলে প্রমাণিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় এই কালিতে লেখা বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে।

৪.০. পাণ্ডুলিপির লিখন পদ্ধতি

৪.১. এটা লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে পাণ্ডুলিপি লেখার ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়মকানুন মেনে চলা হত। প্রথমতঃ পত্রের চারপাশে কিছুটা স্থান মুক্ত রেখে মাঝখানে নির্দিষ্ট একটা অংশে লেখা হত বিষয় বস্তু। সাধারণতঃ প্রশস্ত দিকে এই মুক্ত স্থানটি ১ থেকে ৪ সে. মি. এবং লম্বিত দিকে এর স্থান বা পরিমাণ ৩ থেকে ৭ সে. মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। মধ্যবর্তী স্থানের যে অংশটুকু পাণ্ডুলিপি লেখার জন্য

নির্ধারিত হত সেখানে কোনপ্রকার মার্জিন ছাড়াই অনেকটা অলিখিত ভাবেই যেন একটা নিয়মের সূত্র বেঁধে দেয়া হয়েছিল। প্রথম লাইনের প্রথম বর্ণটি যেখান থেকে শুরু হত এবং শেষ বর্ণটি যেখানে শেষ হত— পরবর্তী লাইনগুলোও ঠিক একই জায়গা থেকে শুরু ও একই জায়গায় শেষ হত। একটুও এদিক-ওদিক হত না। এই নিয়মাবদ্ধ হয়ে শব্দে শব্দে বা পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে কোন ফাঁক না রেখে ক্রমানুযায়ী পত্রগুলো লেখা হত। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে শব্দ থেকে শব্দ কিংবা পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তিতে পার্থক্যবোধক কোন ফাঁক দেখা যায় না। ফাঁক না রেখে লেখার এই রীতি প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পুথিতে বেশী দৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে শব্দ এবং পঙ্‌ক্তিতে পার্থক্যবোধক কোন ফাঁক না রেখে পুথি লেখার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাতে দেখা যায় পত্রের নির্দিষ্ট লেখার স্থানে কোন পংক্তিতে পূর্ণ বক্তব্য বা বাক্য শেষে অল্প কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলেও এবং সেখানে স্থানের স্বল্পতা সত্ত্বেও তারপর থেকেই পরবর্তী পঙ্‌ক্তি শুরু করা হত। আবার পত্রের লেখার নির্দেশিত স্থানে লেখা শেষ না হলে নীচের পঙ্‌ক্তিতে লেখা হত। একটা শব্দের অর্ধেক লেখার পরে যদি নির্দেশিত স্থান শেষ হয়ে যেত তাহলেও পরবর্তী শব্দ নীচের লাইনে লেখা হত। এক্ষেত্রে যদি একটা মাত্র বর্ণও অবশিষ্ট থেকে যেত তাহলে সেটাও লেখা হত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে। এমন কি একটা বর্ণ লেখা সম্ভব নয় এরূপ পরিমাণ স্থান আছে অথচ তা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে, তখন উক্ত পঙ্‌ক্তি পূরণার্থে এবং সৌন্দর্যের হানি না ঘটিয়ে কোন চিহ্ন দ্বারা সেই স্থান পূরণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগ্রহে কয়েকটা পুথিতে এ-সব ক্ষেত্রে +, ঃঃ *,৮ এরূপ বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যে '৮' চিহ্নটি দেখানো হলো তা সংখ্যাবাচক আট (৮) নয়, পঙ্‌ক্তি পূরণার্থে একটি অর্থহীন চিহ্ন মাত্র। লেখার সময় শেষ পঙ্‌ক্তিটি যদি পত্রের অর্দ্ধেকেই শেষ হয়ে যেত তাহলে পঙ্‌ক্তির অবশিষ্টাংশটুকু বিভিন্ন চিহ্ন বা ফুল এঁকে পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষা করা হত। এভাবে সমগ্র পাণ্ডুলিপিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সমতা ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব সমন্বয়। আর এর মাধ্যমে আমাদের মননে যুক্ত হয় পাণ্ডুলিপি-লেখক এবং লিপিকরদের অসীম ধৈর্য, সৌন্দর্য ও পরিশীলিত রুচিবোধের ঈর্ষণীয় পরিচয়। পঙ্‌ক্তিতে সমান্তরলীকরণের এ চিহ্নগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা ধারণা না থাকলে যে কোন পাণ্ডুলিপি পাঠক ও গবেষকের পক্ষে বিভ্রান্তিতে

দিশেহারা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ পাণ্ডুলিপির কোন চিহ্নই যুক্তিহীন কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়, তাই সঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করতে হলে সকল প্রকার বিষয়ের উপরই রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি ও সম্যক ধারণা।

পাণ্ডুলিপির এই চারপাশে ফাঁকা রাখার পেছনেও একাধিক কারণ থাকা স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ পত্রের চারপাশ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। এটা লক্ষণীয় যে দীর্ঘদিনের ব্যবহারে এবং সময়ের ব্যবধানে পত্রের চারপাশ ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন—বৃক্ষ বল্কল, তালপত্র, ভূর্জপত্র, মোটা তুলট কাগজ প্রভৃতির চারপাশ খুব শীঘ্রই ভেঙে যায়; পাতলা তুলট কাগজ, হাতে তৈরী পাতলা কাগজ প্রভৃতির চারদিক যায় ছিন্ন হয়ে। এ সব কথা চিন্তা করেই হয়তো লিপিপত্রের চারপাশে কিছুটা স্থান ফাঁকা রাখা হত।

দ্বিতীয়তঃ পত্রের লম্বালম্বি দুই পার্শ্বে পত্র সংখ্যা লিখিত হত। কোন কোন কোন পুথিতে এক পার্শ্বে এবং কোন কোন পুথিতে উভয় পার্শ্বেই লিখিত হয়েছে পত্রসংখ্যা। এ কারণে দুই পার্শ্বে কিছুটা স্থান ফাঁকা রাখা অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ অধিকাংশ পুথিতেই পত্রের লম্বালম্বি দুদিকের শূন্যস্থানে লেখক বা লিপিকরের আরাধ্য দেব-দেবীকে স্মরণযোগ্য কিছু লিখিত হত। যেমন—শ্রী, শ্রীহরি, শ্রীদুর্গা; ওঁ তারা, শ্রীগুরুবে নমঃ ইত্যাদি শব্দ বা শব্দাবলী কিংবা নিবেদন বাক্য লিখিত হত। আবার কখনও কখনও এ জায়গায় লেখা হত লেখক বা লিপিকরের নাম অথবা তাঁর গুরুদেবের নাম। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের নাম, গ্রন্থের ভিতরের কোন বিশেষ কথা, লেখক বা লিপিকরের কাল প্রভৃতিও দুই পার্শ্বের শূন্যস্থানে লেখা হত।

চতুর্থতঃ পাণ্ডুলিপি লিখতে গিয়ে যদি কোন অক্ষর বা বর্ণ কখনও বাদ পড়ে যেত তাহলে তা পত্রের আড়াআড়ি অর্থাৎ প্রশস্ত দিকে রক্ষিত ফাঁকা স্থানটিতে কোন চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখা হত। আবার কোন লিখিত শব্দ ভুল হয়ে গেলে সেই শব্দটি কালি দিয়ে নষ্ট করে কোন চিহ্ন দিয়ে পত্রের ওপরে বা নীচে শুদ্ধ করে লেখা হত। একারণেও পাণ্ডুলিপির ওপরে ও নীচে কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হত।

পঞ্চমতঃ কোন টীকাকার চারপাশে রক্ষিত শূন্য অংশে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা করতেন। টীকা সংবলিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে চতুষ্পার্শ্বের ফাঁকা স্থান তুলনামূলকভাবে কিঞ্চিদধিক পরিমাণে দৃষ্ট। এখানে মূল বিষয় লেখা হত মধ্যভাগে এবং চারদিকে থাকত তার ব্যাখ্যা। এসকল পাণ্ডুলিপিতে মধ্যবর্তী স্থানের লিপিবর্ণ থেকে বহিরংশের লিপিবর্ণ অধিকতর ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট। সুতরাং এ ধরনের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে সাধারণতঃ বুঝতে হবে যে এটি টীকা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ কিংবা টীকা গ্রন্থ। এভাবেই পাণ্ডুলিপি পত্রে লিখিত মূল অংশের চতুষ্পার্শ্বে পরিদৃষ্ট শূন্যস্থানের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে।

৪.২. পাণ্ডুলিপি লেখার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, পত্রের মধ্যভাগে লম্বালম্বি ৩ থেকে ৮ এবং আড়াআড়ি ২ থেকে ৬ সেন্টিমিটার জায়গা ফাঁকা রেখে লেখা। এটি 'ছাড়' নামে পরিচিত। এ স্থানটি ফাঁকা রাখার প্রধান কারণ হল, উক্ত স্থানটির ঠিক মধ্যে বন্ধনযোগ্য কিছুর সাহায্যে পাণ্ডুলিপি শক্ত করে বেঁধে রাখা। পাণ্ডুলিপিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পোকামাকড় প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা, এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য শক্ত বাঁধনে সংরক্ষণ করার কৌশল সেকালে প্রচলিত ছিল। পাণ্ডুলিপিকে যেমন শক্ত করে বাঁধা হত তেমনি তাকে পালন করা হত সযত্ন লালনে। এ সম্পর্কে সে কালে সে সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—"পাণ্ডুলিপিকে পুত্রের মত পালবে, শত্রুর মত বাঁধবে।" এ কথাটা কেবল সে যুগের মানুষের জন্যই নয়, প্রযোজ্য এ যুগের মানুষের ক্ষেত্রেও। প্রাচীন যুগে এই ছিদ্র করে পাণ্ডুলিপি বাঁধা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ফলে ছিদ্র করার জন্য মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখাও নিয়মে রূপ নিয়েছিল। এ নিয়মের দ্বারা বশীভূত হয়ে পরবর্তী সময়ের অনেক পাণ্ডুলিপির মধ্যভাগে ছিদ্র না রাখলেও ফাঁকা জায়গা কিন্তু ঠিকই রাখা হত। ফলে মাঝখানের এই শূন্য স্থানটি কোন প্রকার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই রক্ষিত হয়েছে একাধিক পাণ্ডুলিপিতে। ১৭ শতকে এসে ধীরে ধীরে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম বা শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। এরপর থেকে বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি মধ্যভাগের কোন অংশ ফাঁকা না রেখেই লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯ শতক পর্যন্ত পাণ্ডু-লিপি লিখনে প্রচলিত হয়ে আসছে এ দুটো রীতিই।

মধ্যভাগের এ অংশটি ফাঁকা রাখার পেছনে আরও একটি কারণ বিদ্যমান। অনেক লেখক বা লিপিকর পত্রের লম্বালম্বি দুদিকে পত্র সংখ্যা না দিয়ে মাঝখানের এই শূন্য অংশের একদিকে বসাতেন। হয়ত দুপার্শ্বের ভাঙার হাত থেকে পত্র সংখ্যাকে রক্ষাকল্পে ছিল এ রীতি। যাই হোক মধ্যভাগে পত্র সংখ্যা লেখা এরূপ পাণ্ডুলিপির নিদর্শন একাধিক।

৫.০. উপরিউক্ত পর্যালোচনায় পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গ বা বহিরবয়ব সম্পর্কিত বিষয়ে যথাসম্ভব পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এবার, সম্পূর্ণ অপরিচায়িত (unidentified) কোন পাণ্ডুলিপি কি প্রকারে সাধারণভাবে পরিচায়িত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। এখানে বিশেষভাবে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন পদ্ধতি একই প্রকার হলেও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির জন্য কিছু অতিরিক্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পরিচায়িত করতে হলে পাণ্ডুলিপি পাঠকের সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির একটি বৃহদংশ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র, কবচ, জ্যোতিষ, স্তোত্র, নীতিশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, বিভিন্ন ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুথি।

৫.১. বিষয় (Subject) নির্ধারণ

পাণ্ডুলিপির বিষয় নির্ধারণের প্রধান সমস্যা হলো অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই বিষয় সম্পর্কে কোন লিখিত বক্তব্য থাকে না। তদুপরি অনেক পাণ্ডুলিপির আবার সম্পূর্ণ অংশও পাওয়া যায় না। কখনও কখনও কোন পাণ্ডুলিপির মধ্যভাগের কিংবা অন্য কোন অংশের সামান্য কয়েকটা পত্র মাত্র পাওয়া যায়। এমন কি কখনও কেবলমাত্র একটি পত্রেরই প্রাপ্তি সম্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে বিষয় নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের কয়েকটি পন্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল। যে সকল বিষয় অবলম্বনে পাণ্ডুলিপি প্রণীত হয়েছে সে সম্পর্কে এ আলোচনার মাধ্যমে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা

করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপির বিষয় নির্ণয় হয়তো সহজতর হবে।

(ক) বেদ: এক কথায় 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা লাভ করা যায় না সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এ কারণে এ গ্রন্থকে বলা হয় বেদ। ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ব ভেদে বেদের চারটি ভাগ আছে।

ঋগ্বেদ— বেদের যে সকল মন্ত্রে অর্থানুসারে ছন্দঃ ও পাদব্যবস্থা আছে সেই মন্ত্রসমূহকে বলা হয় ঋক্। এই ঋক্ মন্ত্রের সংগ্রহই হচ্ছে ঋক্ বেদ।

সামবেদ—গীতিরূপ মন্ত্র অর্থাৎ গানযুক্ত ঋক্কেই বলা হয়েছে 'সাম'। এই সাম মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থই সামবেদ। সামবেদের মন্ত্রসমষ্টির ৭৫টি ব্যতীত আর সকল মন্ত্রই ঋক্বেদে পরিদৃষ্ট। ঋক্ মন্ত্রের ওপর সাতটি স্বর প্রয়োগ করে বিভিন্ন ছন্দে বাদ্যযন্ত্র যোগে সামগান করা হত।

যজুর্বেদ— ঋক্ ও সাম ভিন্ন মন্ত্রসমষ্টি অর্থাৎ যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থই যজুর্বেদ। ঋক্ ও সাম সম্পূর্ণ পদ্যময় হলেও যজুর্মন্ত্র পদ্য ও গদ্য মিশ্রিত। যজুর্বেদেই গদ্যের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। যাগ-যজ্ঞের প্রক্রিয়ার অধিকাংশ নিয়ম-পদ্ধতি এই বেদে নিবদ্ধ।

অথর্ববেদ— এই বেদের একটি প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরস'। ভেষজ বিদ্যা ও শান্তি-পৌষ্টিক ইত্যাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া এবং শত্রু বধের নিমিত্ত মারণ ও উচাটনমূলক অমঙ্গল অভিচার ক্রিয়াদির বিষয় এই বেদে স্থান পেয়েছে। ঋক্ মন্ত্র থেকে এই বেদের একটি বিরাট অংশ গৃহীত হলেও প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা, নানাবিধ রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় প্রভৃতি এখানে আলোচিত হওয়ায় অথর্ববেদ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে চারটি পৃথক স্তরে ভাগ করা যায়। এগুলি নিম্নরূপ:

সংহিতা— সংহিতা অর্থ সংগ্রহ অর্থাৎ বেদমন্ত্রের সংগ্রহ। পৃথক পৃথক শ্রেণী বিন্যাসক্রমে বেদমন্ত্র সমূহকে ঋক্, সাম, যজুঃ, : এবং পরে

স্বতন্ত্রভাবে অথর্ব এই চারভাগে সংগ্রহ করা হয়েছে। অথর্ব সংহিতার মন্ত্র ঋক্ ও যজুঃ-র মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় বলে অনেকের কাছে অথর্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য নয়।

ব্রাহ্মণ— বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা যে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার নাম ব্রাহ্মণ। যাগ-যজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে নিবদ্ধ। ব্রাহ্মণ গদ্যাকারে লিখিত। প্রতি বেদেরই স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্য বেদের কর্মকাণ্ড নামে অভিহিত।

আরণ্যক— কর্মবিষয়ক যাগ-যজ্ঞ এবং জ্ঞানবিষয়ক ব্রহ্ম সম্পর্কিত মিশ্র আলোচনা আরণ্যক সাহিত্যে পরিদৃষ্ট। গদ্য ও পদ্য দুইয়ের সংমিশ্রণে আরণ্যক লিখিত। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী সময়টাই আরণ্যকের কাল। অনেকে পৃথকভাবে আরণ্যককে স্বীকার করতে চান না। এটিকে তারা উপনিষদ হিসেবেই আখ্যায়িত করতে চান।

উপনিষদ— এ অংশটি বেদের জ্ঞান কাণ্ড নামে অভিহিত। সম্পূর্ণজ্ঞান অথাৎ ব্রহ্মসম্পর্কিত আলোচনা উপনিষদের বিষয়বস্তু। উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম। উপনিষদ বলে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অধিকাংশ উপনিষদই ছন্দোবদ্ধভাবে পদ্যাকারে লেখা। তবে কিছু কিছু উপনিষদ আছে যে-গুলি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। কয়েকটি উপনিষদে গল্পাকারে ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে।

উপরিউক্ত বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো তার সাহায্যে এ শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি-নির্ণয় অথাৎ বেদ বিষয়ক পাণ্ডুলিপি-নির্ণয় অনেকখানি সহজতর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

(ক) পুরাণ— অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ নিয়ে পুরাণের সংখ্যা মোট ৩৬টি। বায়ু পুরাণে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। লক্ষণ ৫টি হল (১) সর্গ (সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা); (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়কালে পূর্বসৃষ্টির ধ্বংসের পর নূতন সৃষ্টির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা); (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা); (৪) মন্বন্তর (মনুগণের শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা); (৫) বংশানুচরিত

(নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা)। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ মতে এই লক্ষণগুলি কেবল ১৮শ উপপুরাণ সম্পর্কে প্রযোজ্য। অষ্টাদশ মহাপুরাণের এই পাঁচটি ছাড়া আরও ছয়টি লক্ষণ রয়েছে। লক্ষণগুলি হল ভুবনবিস্তর, দানধর্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত ও দেবতা প্রতিষ্ঠা। অতএব কোন পুরাণের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে পুরাণের নাম পাওয়া না গেলেও এসব লক্ষণগুলি দেখে বোঝা যাবে যে এটি পুরাণ গ্রন্থ।

(খ) রামায়ণ— রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিস্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, সুন্দর এবং উত্তর কাণ্ড। প্রতিটি কাণ্ড একাধিক সর্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। রামায়ণ সূর্য বংশীয় রাজাদের কাহিনী নিয়ে রচিত। এ মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র বা নায়ক রাম। 'বিষয়' পরিচায়নের ক্ষেত্রে কাব্যের বিষয়বস্তু এবং কাণ্ড দেখে সহজেই বোঝা যাবে এটি রামায়ণ গ্রন্থ।

(গ) মহাভারত— মহাভারত চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরু ও পাণ্ডবদের কাহিনী নিয়ে রচিত। রাজ্যের অংশিদারিত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। কুরুবংশীয়দের প্রধান ছিলেন দুর্যোধন আর পাণ্ডবদের প্রধান ছিলেন যুধিষ্ঠির। কাব্যটি ১৮টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি হল—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল এবং স্বর্গারোহণ পর্ব। প্রতিটি পর্ব একাধিক অধ্যায়ে বিভক্ত। পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে 'পর্ব' এবং বিষয়বস্তু দেখে 'মহাভারত' বলে গণ্য করা যাবে।

(ঘ) স্মৃতি— স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র। 'স্মৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— 'যাহা স্মৃত হয় তাহা'। ব্যাপক অর্থে যা শ্রুতি নয় তা-ই স্মৃতি। 'স্মৃতি' দুই প্রকার, প্রাচীন স্মৃতি ও নব্য স্মৃতি। সাধারণভাবে ধর্মসূত্র-গুলিকে, বিশেষতঃ শ্লোকাকারে রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলিকে প্রাচীন স্মৃতির পর্যায়ে ধরা হয়। এর টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, সংক্ষিপ্তসার ও তাদের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধগুলিকে নব্যস্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের নিয়ম-প্রণালী, বিবিধ উপনয়ন, বিবাহাদি, শ্রাদ্ধ ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিভিন্ন অনুশাসন প্রণালী, যজ্ঞবেদীর

পরিমাপ, আকার ও নির্মাণ প্রণালী, নানাবিধ দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি, দেব-দেবী, ঘট, গৃহ প্রভৃতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ভুক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি স্মৃতি বলে গণ্য হবে।

(ঙ) তন্ত্র— সাধারণতঃ যে শাস্ত্রে রহস্যময় মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র, মন্ত্র, চক্র, সিদ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত আছে তাকে তন্ত্রশাস্ত্র বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, শিব ও শক্তি, দেহতত্ত্ব ও মানবপ্রকৃতি, আচার, সিদ্ধি, মন্ত্র, যোগ, দীক্ষা এবং অভিষেক (গুরু ও শিষ্য), পূজা (বাহ্য ও মানসিক), শাস্ত্রজ্ঞান, জপ-তপ, পঞ্চতত্ত্ব, স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, হোম প্রভৃতি বিষয় 'তন্ত্র' হিসেবে গণ্য।

(চ) কোষ—কোষ অর্থ অভিধান। অর্থাৎ শব্দ ও লিঙ্গ নির্ণয়ের অভিধান। শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ, কোন শব্দের কোন লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গনিরূপণ প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ কোষ নামে অভিহিত।

(ছ) জ্যোতিষশাস্ত্র— যে শাস্ত্রের মাধ্যমে বিবিধ গ্রহ-নক্ষত্র, বৎসর, মাস, বার, পক্ষ, রাশিচক্র, কোষ্ঠীনির্ণয়, জাতকনির্ণয়, সময় নির্ণয়, যাত্রার শুভাশুভ, বিবাহের বিভিন্ন লক্ষণাদি এবং শুভাশুভ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, বৃক্ষরোপণাদি ব্যবস্থা, শস্যছেদন, মোক্ষ দীক্ষা প্রভৃতি বিষয় এবং যাকে ভিত্তি করে মানুষের ভাগ্যের শুভাশুভ ফল সম্পর্কে জানা যায় সেই শাস্ত্রকে জ্যোতিষশাস্ত্র বলে। বিভিন্ন চক্র, গণনাপদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি বিচারের মাধ্যমে এই ফলাফল নির্ণয় করা হয়। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণগুলি দেখে কেবল পাণ্ডুলিপিকে সহজেই জ্যোতিষশাস্ত্র বলে নিরূপণ করা যায়।

৫.২. বিষয়ের কথা পরিষ্কার রূপে লেখা না থাকলেও অনেক সময় কেবল গ্রন্থের 'নামের' মাধ্যমে বিষয় নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। যেমন—অভিষেক বিধি, অমরার্থচন্দ্রিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, দেবীমাহাত্ম্যম্, মঠপ্রতিষ্ঠা, জাতকনির্ণয়, শ্রাদ্ধতত্ত্ব ইত্যাদি। এখানে গ্রন্থের নাম দেখে বা পড়েই আমাদের বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে যায়। যখন এই নামের মাধ্যমেও বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা না যায় কিংবা ধারণা করা গেলেও সঠিক বস্তু সম্পর্কে হতে হয় দ্বিধান্বিত তখন ঐ নামের সূত্র ধরে 'বর্ণনামূলক ক্যাটালগ' (Descriptive catalogue) খুঁজলে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যেতে পারে। যে ক্ষেত্রে কোন খণ্ডিত পত্রে নামও থাকে অনুল্লেখিত সেক্ষেত্রে ঐ পত্রটির বিষয়ের কোন বিশেষ

সূত্র ধরে তৎসম্পর্কিত কোন অনুমিত গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে অথবা 'বর্ণনামূলক ও সংক্ষিপ্ত' ক্যাটালগের সাহায্যে অনুমিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে। এভাবে কেবল অনুসন্ধানের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৬.০. নাম নির্ধারণ (Title) : পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয় হল এর নাম নির্ধারণ করা। সাধারণতঃ গ্রন্থের নাম পাণ্ডুলিপির প্রথম পত্রে ও শেষ পত্রে পুষ্পিকা অংশে লিখিত হয়ে থাকে। তবে একাধিক পরিচ্ছেদে (বা অধ্যায়, পটল, খণ্ড ইত্যাদিতে) বিভক্ত কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পরিচ্ছেদ (বা অধ্যায়াদি) শেষ হওয়ার প্রাক্কালে লেখা থাকে উক্ত গ্রন্থের নাম। রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত, কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে সাধারণতঃ প্রথম পত্রে নাম লিখিত হয়নি, হয়েছে পরিচ্ছেদ শেষে এবং গ্রন্থ শেষে। যেমন পরিচ্ছেদ শেষে—"ইতি মহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি-পাণ্ডবমন্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ[১৩]। গ্রন্থ শেষে—"ইতি শ্রীচন্দ্রমাণিক্যদেব রচিতমপদেশ শতকম্"[১৪]। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে যদি প্রথম ও শেষ পত্রে গ্রন্থের নাম লেখা না থাকে কিংবা প্রথম ও শেষ দিকের কিছু পত্র খণ্ডিত থাকে তাহলে ভিতরে পটল বা পরিচ্ছেদ থাকলে তার প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ; এখানেও যদি নাম না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং তখন হয়তো কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাওয়া যাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রাপ্তি ঘটবে নামের সন্ধান। এ ক্ষেত্রে বিষয় অনুসন্ধানের পন্থা অবলম্বন করেও নামোদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থারম্ভে কিংবা পরিসমাপ্তিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যেও গ্রন্থের নাম পাওয়া যেতে পারে।

৭.০. পত্র সংখ্যা (**Page number**)

পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের আর একটি মূল্যবান বিষয় হলো ক্রমানুসারে পত্র সাজানো। আমরা 'পৃষ্ঠা' বলতে যা বুঝি 'পত্র' তা থেকে ভিন্ন। পত্রের পিঠকেই বলে পৃষ্ঠা, অতএব একটি পত্রের এ-পিঠ ও-পিঠ নিয়ে হয় দুই পৃষ্ঠা। পাণ্ডুলিপি পত্র হিসাবেই গণনা করা হয় এবং পত্রের যে কোন এক পার্শ্বে পত্র সংখ্যা দেয়া হয়। সাধারণতঃ পত্রের

যে পার্শ্বে সংখ্যা লিখিত হয় সেই পৃষ্ঠাটি ঐ পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা/পিঠ অর্থাৎ 'খ' হিসেবে ধরা হয় এবং সংখ্যাবিহীন পৃষ্ঠাটি প্রথম পৃষ্ঠা/পিঠ অর্থাৎ 'ক' হিসেবে ধরা হয়। যেমন—৫(ক) ও ৫(খ)। তবে পত্রে সংখ্যা লেখা পার্শ্বটি প্রথম পৃষ্ঠা হিসেবে এবং সংখ্যাবিহীন পার্শ্বটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ নিদর্শনও বিরল নয়। বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব ও স্থিতি রেখে যে পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তার সৌন্দর্য যেমন বিনষ্ট তেমনি তা অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল। অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপির পত্রগুলি তাই একদিকে যেমন অবিন্যস্ত, ক্রমবিহীন, অপরদিকে তেমনি একটা বিশেষ বিষয় সম্বলিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ভিন্ন বিষয়ক পাণ্ডুলিপির পত্র। এসব ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য অতিশয় যত্নে ও সচেতনায় পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পত্র অধ্যয়ন করে পত্রের সংখ্যার ক্রমানুসারে তাকে শৃঙ্খলায়িত করা। অনেক সময় দেখা যায়, একটা পাণ্ডুলিপির মধ্যে অন্য আর একটা পাণ্ডুলিপির অনুপ্রবেশ এমনভাবে ঘটেছে যে সাধারণভাবে বা একটু অসতর্ক হলে বুঝতে ভুল হতে পারে। যেমন একটা পাণ্ডুলিপির ৪র্থ পত্রের পরে অন্য একটা পাণ্ডুলিপির ৫ম/৬ষ্ঠ পত্র আছে। এখানে ঐ ৪র্থ পত্রের পর অসতর্কতা বশতঃ ৫ম/৬ষ্ঠ হিসেবে গুণে গেলে সম্পূর্ণ বিষয়টিই ভুল হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি পত্র গণনা করার সময় অতীব নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, একটি পত্রের সঙ্গে অন্যপত্রের লেখার উপকরণ, লেখার রীতি, লিখিত বিষয়বস্তুর মিল আছে কিনা। যেমন—লেখার আধার (যার উপর লেখা হত), কালি এক কিনা, লেখার বিষয় এক, না ভিন্ন; লেখার রীতিই (বৈশিষ্ট্য) বা কেমন, দুইটি পত্রের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা সমান কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা করলেই সহজভাবে পার্থক্য ধরা পড়বে। অনেক সময় লেখার উপাদান ভিন্ন কিন্তু বিষয়বস্তু এক এমনও দেখা যায়। তবে এর নিদর্শন খুবই কম। মোট কথা খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি পত্র পরীক্ষা করতে হবে।

ক্রমানুসারে পত্র নির্ধারণের আর একটি জটিল বিষয় হল, অনেক সময় প্রাচীনত্বের জন্য দুই পার্শ্বের পত্র সংখ্যা লেখা অংশটি ভেঙে যায় বা ছিঁড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে পত্র সাজাতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ পত্রের ভিতরে যে শ্লোক সংখ্যা থাকে তার ক্রমানুসারে পত্র সাজানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তু অনুসারে পত্র সাজানো যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় পত্রেও শ্লোক সংখ্যা থাকে না এবং বিষয়বস্তু অনুসারে সাজাতেও কষ্ট হচ্ছে। সেক্ষেত্রে একটা সহজ উপায়ে সমাধানে আসা সম্ভব। ঐ সমস্যাপূর্ণ পাণ্ডুলিপিটির অন্য কোন কপি আছে কিনা তা ক্যাটালগের মাধ্যমে জেনে কিংবা ওর কোন সম্পাদিত গ্রন্থ থাকলে তা বের করে ঐ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নির্ভুলভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে পত্র সাজানো যেতে পারে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় পাণ্ডুলিপিটি সর্বাংশেই সুন্দর রয়েছে, অথচ পত্র সংখ্যা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় বুঝতে হবে। এক, লেখক বা লিপিকরের ভুলবশতঃ হয়তো পত্র সংখ্যা লিখিত হয়নি। দুই, লেখক বা লিপিকর ইচ্ছা করেই হয়তো পত্রসংখ্যা লেখেননি। অনেক সময় দেখা যায়, লেখক বা লিপিকররা ইচ্ছা করেই পত্র সংখ্যা না লিখে একটি পত্রের শেষ লাইনের কিছু অংশ অন্য পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে লিখতেন। তারপরে পৃষ্ঠা থেকে পত্রে এভাবে ক্রম রক্ষা করা হত। কাজেই পত্র সংখ্যা বিহীন পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে এ বিষয়টার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত পরিচায়নে পত্রসংখ্যা লেখার নিয়ম নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে: পুথিটি যদি মোট ৫০ পত্রে সম্পূর্ণ হয় এবং সব কটি পত্রই থাকে তাহলে লিখতে হবে

(ক) ১-৫০ (সম্পূর্ণ)

আর যদি অসম্পূর্ণ হয় তাহলে শুধু যে পত্রগুলি আছে তার সংখ্যাই উল্লেখ করতে হবে। যেমন—

(খ) ১-৩, ৭-১৫, ১৭-৫০ ইত্যাদি (অসম্পূর্ণ) এবং যেক্ষেত্রে কোন পত্রসংখ্যা উল্লেখ নেই এরূপ (৫০ পত্রের একটি পুঁথি সম্পর্কে লিখতে হবে

(গ) মোট ৫০ (পত্র সংখ্যা বিহীন)।

৮.০. সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ (Complete/Incomplete) নির্ধারণ

কোন একটি পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডিত অবস্থা এবং অসম্পূর্ণতা বা খণ্ডিত অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, একটি পত্র নিয়েও সম্পূর্ণ হতে পারে একটি পাণ্ডুলিপি, আবার ৫/৬ শত পত্র নিয়েও একটি পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। এখানে কথা হলো, একটি পাণ্ডু-লিপি যেখান থেকে শুরু করা হবে এবং যেখানে গিয়ে শেষ হবে তার মধ্যস্থিত সবকটি পত্রই এক সঙ্গে সন্নিবদ্ধ থাকতে হবে। যেমন ধরা যাক—পঞ্চাশ সংখ্যক পত্রে গিয়ে একটি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু লেখা শেষ হয়েছে। এবং সবক'টি পত্রই সেখানে অবিকৃত রূপে বর্তমান, কেবল তখনই উক্ত পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পূর্ণ বা অখণ্ডিত বলা যাবে। কিন্তু এর মধ্য থেকে একটি মাত্র পত্রও লুপ্ত হলে পাণ্ডুলিপিটি তার সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতা হারাবে। যেমন—একশত পত্রের একটি পাণ্ডু-লিপির কেবলমাত্র পঞ্চম পত্রটি নেই, কিন্তু এর অন্য সকল পত্র অবিকৃত রূপে আছে এবং তার আরম্ভ ও সমাপ্তিও যথাযথভাবে রয়েছে তথাপিও এ পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পূর্ণ বলা যাবে না, তাকে অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিতই বলতে হবে।

৯.০. লেখক/লিপিকর (Author / Copy writer) নির্ধারণ

পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে লেখক পরিচিতিও একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়। বহু শতাব্দের ব্যবধানে আজ আমরা যে সকল পাণ্ডুলিপি পাচ্ছি তার অধিকাংশই প্রায় লিপিকৃত। লেখকের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি খুব বেশী একটা পাওয়া না গেলেও যা পাওয়া যায় তার সংখ্যাও কম নয়। অনেক পাণ্ডুলিপিতে লেখক ও লিপিকরের নাম একই সঙ্গে লিখিত হয়েছে। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে কেবল লেখকের নাম কিংবা কেবল লিপিকরের নাম লিখিত হয়েছে। এই লিখিত নামের ভিতর থেকে কোনটি লেখকের নাম আর কোনটি লিপিকরের নাম এবং কখনওবা কোনটি টীকাকারের নাম তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে হবে। কেননা লিপিকরের নামের সঙ্গে 'লিপিকর' কথাটি এবং লেখকের নামের সঙ্গে 'লেখক' কথাটি লেখা থাকে না। লেখকের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র 'বিরচিতম্', 'কৃত', এবং 'বক্তি' শব্দগুলি নামের পরে কিংবা পূর্বে লেখা থাকে। যেমন— (ক) শ্রী রঘুনন্দন

ভট্টাচার্য বিরচিতম্। (খ) শ্রীমতামীননাথেন ক্রিয়তে স্মরদীপিকা।[১৫] (গ) জ্যোতিঃ শাস্ত্রেষু তত্ত্বানিবক্তি শ্রী রঘুনন্দন।[১৬] আর যে সকল পাণ্ডুলিপিতে নামের পরে কিংবা পূর্বে 'স্বাক্ষরম্', 'লিখিতম্', 'লিং', 'লিপিরিয়ং' প্রভৃতি শব্দ লেখা থাকে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে তিনি লিপিকর। অর্থাৎ উক্ত যে কোন একটি শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নামটি হবে, লিপিকরের। যেমন (ক) শ্রীরাজকৃষ্ণবিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য দ্বিজ-মনীষিনা লিখিতেয়ং স্বীয়পুস্তিকেতি।[১৭]

(খ) "শ্রী কালিনাথ শর্ম্মনঃ স্বাক্ষরমিদংপুস্তকঞ্চ।[১৮]

(গ) "লিং হরিনারায়ণ দত্তঃ।"

(ঘ) "শ্রী মধুসূদনদেব শর্ম্মনো লিপিরিয়ং পুস্তকঞ্চোত।"[১৯]

(ঙ) "শ্রী কমলাশর্ম্মনঃ পুস্তিকেয়ং শ্রী গঙ্গাদাস শর্ম্মনা লিখিতম্।"[২০]

এখন এই লেখক বা লিপিকরের নাম একটা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও একটা সাধারণ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখকের নাম সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপির তিনটি জায়গায় পাওয়া যায়—প্রথম পত্রে, শেষ পত্রে এবং গ্রন্থ মধ্যস্থিত অধ্যায় শেষে। প্রথম পত্রে স্তুতি বাক্যের পর গ্রন্থের নাম সম্পর্কে কিছু কথা লেখার পর কিংবা নামের সঙ্গেই বিষয়বস্তু শুরু করার পূর্বে অনেক সময় লেখকের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থ মধ্যে যদি কোন অধ্যায় ভাগ করা থাকে তবে সেই অধ্যায় শেষ করার জায়গায় অনেক সময় লেখকের নাম পাওয়া যায়। আর শেষ পত্রে লেখকের নাম লিখে গ্রন্থ শেষ করা হয়, আবার কখনও কখনও গ্রন্থ শেষ করে লেখকের নাম লিখিত হয়। লিপিকরের নাম সাধারণতঃ পাওয়া যায় পাণ্ডুলিপির শেষ পত্রে। শেষ পত্রে গ্রন্থ শেষ করার পরে লিপিকরের নাম লিখিত হয়। যেমন—"ইতি স্কন্দপুরাণে গীতামাহাত্মৎং সমাপ্তম্ শ্রী ভুবনচন্দ্র শর্ম্মনা লিখিতমিদম্ ঃ[২১] লেখক বা লিপিকরের নাম কখনও কখনও সহজ রূপেও পাওয়া যায় আবার কখনও কখনও পাওয়া যায় কাব্যাকারে শ্লোকবদ্ধরূপে গ্রন্থশেষে পুষ্পিকা অংশে। যেমন—

ধ্যাত্বা শ্রীশিবসুন্দরী লিখিতবান্ তন্ত্রস্যসারংবৃহৎ
দুর্গাকিঙ্করচক্রবর্ত্তিন ইমং শ্রীবাবুপূর্বস্য চ।[২২]

১০.০. **লিপিকাল** (Time of copy writing)

পাণ্ডুলিপির লিপিকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা প্রাচীন যুগে খ্রীস্টাব্দ এবং বর্তমান বাংলা সনে লিপিকাল সাধারণতঃ লেখা হত না। এখানে শকাব্দ, সম্বৎ, বঙ্গাব্দ, মঘিঅব্দ, মল্লাব্দ, ত্রিপুরাব্দ, লক্ষণাব্দ, পালাব্দ, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমেই লিপিকাল লিখিত হত। লিপিকাল সাধারণতঃ লেখা হত লেখক বা লিপিকরের পুষ্পিকা অংশে। পুষ্পিকা অর্থাৎ লেখক বা লিপিকর গ্রন্থের শুরুতে, অধ্যায় শেষে, এবং গ্রন্থ শেষে যেখানে নিজের আত্মবিবরণীমূলক এবং গ্রন্থসম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থের রচনা কাল সম্পর্কে যে অংশটি লিখে রাখতেন সে অংশকে পুষ্পিকা (Colophon) বলা হয়। লিপিকরের পুষ্পিকা সাধারণতঃ গ্রন্থের শেষেই লিখিত হত। অনেক সময় লিপিকরের কবিত্বগুণে এই পুষ্পিকা সুদীর্ঘও হত। ১৮শ শতকের রহিমুন্নেসা নাম্নী এক লিপিকর আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের অনুলিপি প্রস্তুত করার সময় পুথির শেষে নিজের আত্মবিবরণী-মূলক এক সুদীর্ঘ অধ্যায় সংযোজন করেছেন। যাই হোক এই পুষ্পিকা অংশে অনেক সময় রচয়িতার কাল, লিপিকরের কাল এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য লিখিত হত। এমনকি কোন্ মাস, কি বার, কোন লগ্নে, কোন দিকে ফিরে পাণ্ডুলিপি লিখিত হল সে সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা লিখিত হত। এই পুষ্পিকা অংশে এবং লেখক বা রচয়িতার লিখিত গ্রন্থের সময় সম্পর্কে যে পুষ্পিকা লেখা হত তা পাণ্ডুলিপির প্রথমভাগে কিংবা অধ্যায় শেষে অথবা গ্রন্থ শেষে পাওয়া যায়। তবে প্রথমভাগে এবং অধ্যায় শেষে সময়কাল সম্পর্কে লিখিত পুথির সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ পুথিতেই গ্রন্থশেষে সময় সম্পর্কে গদ্যাকারে, কাব্যাকারে লিখিত হত। তবে যে সকল পাণ্ডুলিপিতে এই তিন জায়গায় সময় সম্পর্কে কিছু জানা না যায় সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটিকে মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে বা পড়তে হবে। কেননা কোথাও না কোথাও সময় সম্পর্কে কোন না কোন তথ্য কখনও কখনও হয়তো পাওয়া যেতেও পারে। এছাড়াও পাণ্ডুলিপির লেখার উপকরণ, লেখার রীতি, লিখিত বিষয়বস্তু, লেখক বা লিপিকরের আত্মবিবরণীমূলক তথ্য প্রভৃতির মাধ্যমেও অনেক সময় কাল সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

১০.১. এখন পাণ্ডুলিপিতে লিখিত সময় সম্পর্কিত অব্দগুলি কিভাবে খ্রীস্টাব্দে নিরূপণ করতে হবে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

শকাব্দ :

খ্রীস্টাব্দ শুরু হওয়ার ৭৮ বৎসর পরে শকাব্দ শুরু হয়েছে। এ কারণে শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—আমরা পাণ্ডুলিপি থেকে পেলাম ১৫৬০ শকাব্দ এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করে লিখতে হবে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ১৫৬০ শকাব্দ=১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ। এরূপভাবে মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৬ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যাবে। যেমন—১০২১ মল্লাব্দ+৬৯৬=১৭১৭খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ১০২১ মল্লাব্দ=১৭১৭ খ্রীস্টাব্দ।

'বঙ্গাব্দের' সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যাবে। যেমন—১২৪৪ বঙ্গাব্দ+৫৯৩=১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ১২৪৪ বঙ্গাব্দ=১৮৩৭ খ্রী.

'সম্বৎ' থেকে ৫৭ বিয়োগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১৮৫৫ সম্বৎ—৫৭=১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ। 'মঘী' অব্দ'-এর সঙ্গে ৬৩৮ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যাবে। যেমন—৯৭৩ মঘীঅব্দ+৬৩৮ =১৬১১ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ৯৭৩ মঘীঅব্দ=১৬১১ খ্রীস্টাব্দ। 'ত্রিপুরাব্দ'-এর সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২০৮ ত্রিপুরাব্দ+৫৯০=১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ১২০৮ ত্রিপুরাব্দ=১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ। 'লক্ষ্মণাব্দ' এর সঙ্গে ১১১৮ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১৮১ লক্ষ্মণাব্দ+১১১৮=১২৯৯ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ১৮১ লক্ষ্মণাব্দ ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দ।

১০.২. এ সব অব্দগুলি পাণ্ডুলিপিতে দু'প্রকারে লেখা হত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে গদ্যাকারে সহজরূপেই লেখা হত, আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে লেখা হত পদ্যাকারে জ্যোতিষশস্ত্রীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে। শাস্ত্রীয় বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থ সম্পর্কে অবহিত না থাকলে এ সব পাণ্ডুলিপির কাল নির্ধারণ করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব। কেবল সময় নির্ধারণ নয় গ্রন্থের নাম, লেখক—

লিপিকরের নাম প্রভৃতিও লিখিত হত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে এবং সুকৌশল শব্দ প্রয়োগে। সুতরাং পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক এবং তার মর্মার্থ আলোচনা কর াহল।

(ক) নেত্রেন্দু সিন্ধু ক্ষিতি শাক সম্মিতে
গ্রেহায়নীয়াসিত পক্ষতৌ হরিম্।[২৩]
'নেত্রেন্দু সিন্ধু ক্ষিতিশাক'
নেত্র (ত্রিনেত্র=দর্শনেন্দ্রিয়ের ২টি নেত্র এবং ১টি জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞান নেত্র =৩
ইন্দু (চন্দ্র)=১
সিন্ধু (সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সাত সমুদ্র)[২৪] =৭
ক্ষিতি (পৃথিবী)=১
শাক=শকাব্দ

প্রাচীনকালে এ পদ্ধতিতে সাল গণনায় দুটি রীতি প্রচলিত ছিল— 'দক্ষিণাগতি' এবং অপরটি 'বামাগতি'। 'দক্ষিণাগতির' অর্থ হল শ্লোকস্থ শব্দগুলি বাম দিক থেকে ডানদিক গুণতে হবে এবং 'বামাগতি' ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ডান দিক থেকে বামে গুণতে হবে। পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ সালই লিখিত হয়েছে বামাগতি পদ্ধতিতে। উপরিউক্ত সালটিও বামাগতি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। ফলে এখানে গণনায় যে সালটির প্রাপ্তি ঘটল তা হলো ১৭১৩ শকাব্দ। উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত সালটি দক্ষিণাগতিতে গণনা করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা হল ৩১৭১ কিন্তু এটি আমাদের জ্ঞাত কোন সালের ব্যাপ্তিতেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব সাল গণনার শব্দগুলো থেকে সংখ্যা বের করে প্রথমেই দেখতে হবে যে এটি কোন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে এবং সেই পদ্ধতিতেই সালটি গণনা করতে হবে। অতএব আমাদের আলোচ্য উল্লিখিত সালটি অবশ্যই ১৭১৩ শকাব্দ এবং (১৭১৩+৭৮)= ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ।

(খ) রস শূন্য সপ্তদশ শকাব্দে শশিবাসরে
আষাঢ়ে মাসি সম্পূর্ণঃ কৃতোহয়ং গ্রন্থমাত্মনঃ।।[২৫]

'রস শূন্য সপ্তদশ শকাব্দ'

রস =৬[২৬]
শূন্য=০
সপ্তদশ=১৭

বামাগতি পদ্ধতিতে এ গণনায় হয় ১৭০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৬+৭৮=১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ।

(গ) শাকেরন্ধ্র শ্রুতিকুসুমলিট্‌পাদ শীতাংশু সংখ্যেনত্বা
যত্নাদমলকমল প্রখ্যপাদং পুরাবেঃ।[২৭]

এখান 'শাক' শব্দের অর্থ শকাব্দ
'রন্ধ্র' শব্দের অর্থ শূন্য=০
'শ্রুতি' শব্দের অর্থ বেদ[২৮]=৪

কুসম লিট্‌পাদ[২৯] শব্দের দ্বারা ভ্রমরের ছয়টি পায়ের কথা বলা হয়েছে=৬
এবং শীতাংশু শব্দের অর্থ চন্দ্র=১
অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শাক (শকাব্দটি)
১৬৪০ বা খ্রীষ্টাব্দ (১৬৪০+৭৮)=১৭১৮

(ঘ) শর বেদর্ষি ভূমানে শাকে কলসজোরুণে
লিখিতা মাথুরী টীকা শিবনাথেন শর্ম্মনা।।[৩০]
"শরবেদর্ষি ভূমানে শাকে"

এখানে শর অর্থ পঞ্চশর বা পঞ্চবান[৩১]=৫
বেদ অর্থ চতুর্বেদ=৪
ঋষি অর্থ সপ্তর্ষ্ঠি[৩২]=৭
এবং ভূ অর্থ পৃথিবী=১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় এ শকাব্দটি (শাক) হবে ১৭৪৫ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৭৪৫+৭৮)=১৮২৩

(ঙ) খ যুগ মুনি কুশাকে লিপ্ত পুস্তীং স্বকীয়া
মবনি সুরকুলোদ্ভূঃ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়াম্ ।।[৩৩]

"খ যুগ মুনি কুশাকে"

এখানে খ অর্থ আকাশ যার গাণিতিক মান শূন্য, অতএব খ যুগ বলতে বোঝায় দুইটি শূন্য=০০

মুনি অর্থ সপ্তমুনি বা ঋষি=৭

এবং কুঅর্থ পৃথিবী=১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় প্রাপ্ত শাক (শকাব্দ)=১৭০০ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৭০০+৭৮)=১৭৭৮

(চ) দ্বে দ্বে মুনীন্দু উদয়ে শাকেন্দুমন্দাত্মজভাগ
দিবসে সৌম্যেচবারেপি চ ।[৩৪]

এখানে 'দ্বে' একটি সংখ্যাবোধক শব্দ। এর গাণিতিক মান দুই।

অর্থাৎ দ্বে=২

দ্বে=২

মুনি বলতে সাতজন মুনি বা ঋষিকে বোঝানো হয়েছে=৭

এবং ইন্দু অর্থ চন্দ্র=১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় শাক (শকাব্দ) হয় ১৭২২ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৭২২+৭৮)=১৮০০

(ছ) শাকে ভূরস সপ্তি ভূমি বিমিতে সিংহেগতে পুষণি,
পঞ্চাংশে কুজ বাসরে হরিতিথৌ শ্রীরামদাসোদ্বিজঃ ।।[৩৫]

'শাকে ভূর সপ্তি ভূমি বিমিতে'

এখানে 'ভূ' শব্দের অর্থ পৃথিবী=১

'রস' বলতে ছয়টি রসের কথা বলা হয়েছে=৬

'সপ্তি'[৩৬] বলতে 'সপ্তাশ্ব' কে বোঝানো হয়েছে=৭

'ভূমি' শব্দের অর্থ পৃথিবী=১

বামাগতি পদ্ধতিতে গণনা করলে এখানে যে শকাব্দটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে ১৭৬১ এবং খ্রীস্টাব্দ ১৭৬১+৭৮=১৮৩৯

(জ) শক দৃগশ্ব শক্রে নভসি নভোমনি দিনে
ষষ্ঠ্যাং ব্রজপতি সদ্মনি রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ[৩৭]

এখানে 'দৃক্' শব্দ চোখ অর্থে অর্থাৎ ত্রিনেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে=৩
'অশ্ব' অর্থাৎ সপ্তাশ্ব=৭
এবং 'শক্র' অর্থে ইন্দ্র[৩৮]=১৪

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শক (শকাব্দটি) ১৪৭৩ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৪৭৩+৭৮)=১৫৫১।

(ঝ) বিধিবেদাদ্রীন্দু শকে নভসী শনেত্রমিতে,
অভিধানং সৌম্যদিনে ব্যলিখৎ শ্রীরামজয় দ্বিজ॥[৩৯]
'বিধি' শব্দের অর্থ ঈশ্বর=১
'বেদ' বলতে চারিবেদের কথা বলা হয়েছে=৪
'অদ্রি' শব্দের অর্থ পর্বত[৪০]=৭
এবং 'ইন্দু' অর্থ চন্দ্র=১

এখানে বামাগতি পদ্ধতিতে যে শাক (শকাব্দটি) প্রাপ্ত হ'ল তা ১৭৪১ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৭৪১+৭৮)=১৮১৯

(ঞ) শাকে সাগর শীতদীধিতি ধরাধার্য্যোষধীশোন্মিতে
ভাদ্রস্যামৃত ধৃষ্টিলোচনমিতে শুক্লাষ্টমীত স্তিথৌ।[৪১]
'শাকে' শব্দে শকাব্দ বোঝানো হয়েছে।
'সাগর' অর্থে বোঝানো হয়েছে সাত সমুদ্রকে=৭
'শীতদীধিতি' শব্দের অর্থ চন্দ্র=১
'ধরাধারী' শব্দের অর্থ পর্বত=৭
এবং 'ওষধীশ' শব্দের অর্থ চন্দ্র=৭
অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শকাব্দটি হ'ল ১৭১৭ এবং খ্রীস্টাব্দটি (১৭১৭+৭৮)=১৭৯৫।

(ট) শ্রীরুদ্র নারায়ণ রায়তুষ্ট্যা অপ্লর্থিনাংপ্রাণভৃতাং পরায়ৈ,
পঞ্চাগ্নি কালেশ কপালভালে শাকে পিতৃনাং যবদানকালে।[৪২]

এখানে 'পঞ্চাগ্নি'[৪৩] বলতে পাঁচ প্রকার অগ্নির কথা বলা হয়েছে =৫
'কালেশ' শব্দটি শিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে =১
'কপাল' বলতে এখানে মাথার খুলির চারটি অংশকে বোঝানো হয়েছে=৪
এবং 'ভাল' বলতে এখানে মস্তকের সম্মুখভাগকে বোঝানো হয়েছে=১
এরূপভাবে বামাগতি পদ্ধতিতে যে শকাব্দটি প্রাপ্ত হল তা ১৪১৫ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৪১৫+৭৮) ১৪৯৩।

(ঠ) নাগেন্দু গোত্রক্ষিতি সংখ্য শাকেমীনাগতভানোবসু চন্দ্রমানে।
মহ্যাত্মজাহেশিবকালি দাসোলিলেখ পুস্তিংবটুরামরাম।।[৪৪]

'নাগ' শব্দের গাণিতিক অর্থ আট, অর্থাৎ অষ্টনাগ[৪৫]=৮
'ইন্দু' অর্থ চন্দ্র=১
'গোত্র' শব্দ পর্বত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে=৭
এবং 'ক্ষিতি' শব্দের অর্থ পৃথিবী=১

এখানেও বামাগতি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ নিয়মে যে শাক (শকাব্দটি) পাওয়া গেল তা হলো ১৭১৮ এবং খ্রীস্টাব্দ (১৭১৮+৭৮) ১৭৯৬।

১০.৩ লেখক, লিপিকর এবং গ্রন্থের নাম প্রকাশক কয়েকটি শ্লোক।

(ক) ইতি শ্রীরাম চন্দ্রাখ্য ন্যায় বাগীশধীমতা।
সুধীভিরাভিধীয়েত কৃপয়া কাব্য চন্দ্রিকা ।।[৪৬]

এখানে লেখকের নাম শ্রীরাম চন্দ্রন্যায় বাগীশ, এবং কাব্যের নাম 'কাব্য চন্দ্রিকা'—শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(খ) নত্বা স্বপঠায় চ কাব্য চন্দ্রিকাং
মুদালিখৎ শ্রীযুতরাম সুন্দরঃ।।[৪৭]

উক্ত শ্লোকে লিপিকরের নাম 'শ্রীযুতরাম সুন্দর' এবং কাব্যের নাম 'কাব্য চন্দ্রিকা' লিখিত হয়েছে।

(গ) শ্রীরামরাম বিপ্রেন গীতামাহাত্ম্যমুক্তম্।
লিখিতংগমীয় (?) মানস্য পাদপদ্মং গদাভূতঃ।।[৪৮]

এই শ্লোকটিতেও লিপিকরের নাম 'শ্রীরামরাম বিপ্র (ব্রাহ্মণ) এবং গ্রন্থের নাম 'গীতামাহাত্ম্যম্' লিখিত হয়েছে।

এরূপ শ্লোকাকারে সুকৌশল শব্দ প্রয়োগে ও চাতুর্যে লেখা সময়, লেখক, লিপিকর, গ্রন্থ প্রভৃতির পরিচিতির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে প্রাচীন বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে। বর্তমান সময়ে যেহেতু খ্রীস্টাব্দের প্রচলন

বেশী সেহেতু কোন পাণ্ডুলিপিতে এসব বিভিন্ন অব্দে লেখা লিপিকালের পার্শ্বে এর সঙ্গে সম্পর্কিত খ্রীস্টাব্দও উল্লেখ করা উচিত। কেননা এ সকল প্রাচীন অব্দের সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচয় না-থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই সহজভাবে সকলের বোঝার জন্য প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা অব্দের সঙ্গে খ্রীস্টাব্দ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

১০.৪. এরূপ হেয়ালীপূর্ণ শ্লোকের শব্দগুলি কল্পিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র, দেব-দেবী ও মানুষের নাম এবং তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, মাস-বৎসর, মুনি-ঋষির নাম, পার্থিব জগতের নানা বিষয়, প্রাচীন যুগের বিখ্যাত বিভিন্ন বিষয় প্রভৃতি থেকে। নিম্নে সংখ্যার ক্রমানুসারে বিভিন্ন সংখ্যাবোধক শব্দের একটি তালিকা প্রদত্ত হল।

০—শূন্য, বিন্দু, রন্ধ্র, পঞ্চমভূত, রিক্ত, কান্তামধ্য, বিষ্ণুপদ, আকাশ, অনন্ত, ব্যোম, খ, অন্তরীক্ষ, নভঃ, বিয়ৎ, গগন, অম্বর, অভ্র, বিহায়স, ঘনাশ্রয়, সুরপথ, উড়ুপথ, মরুৎপথ, দ্যো, দিং, দিব, গগনমণ্ডল, নভোমণ্ডল, গগনতল, বায়ুমণ্ডল, নভস্তল, গগনান্তরাল।

১—অত্রিজাত, অত্রিনেত্রজ, অত্রিদৃগজ, অত্রিনেত্রপ্রসূত, অত্রিনেত্রভূ, অব্জ, অব্ধিজ, ইন্দু, ওষধীশ, ওষধীনাথ, ওষধীরপতি, কলাধার, কলানিধি, কলানাথ, কুমুদবান্ধব, কলাপ, খচমস, চন্দ্র, চন্দ্রমা, তুহিনকর, তুহিনদীধিতি, তুহিনাংশু, দ্বিজপতি, দ্বিজরাজ, দ্বিজেশ, দশাশ্ব, দশবাজী, তুষারকর, নক্ষত্রেশ, নভশ্চমস, নভোমণ্ডলদ্বীপ, নিশামণি, নিশিরাজ, নিশাকর, নিশানাথ, নিশাপতি, নক্ষত্রপতি, বিধু, ভগ্নাত্মা, ভুবন্যু, মৃগাঙ্ক, মগলাঞ্চন, যামিনীনাথ, যামিনীপতি, যামিনীভূষণ, রজনীকর, শশধর, শশী, শশাঙ্ক, শীতরশ্মি, শীতাংশু, শশবিন্দু, শশভৃৎ, শশলাঞ্ছন, শুচি, শুচিরোচি, শুভ্ররশ্মি, শুভ্রাংশু, সোম, সুধাকর, সবণ, সুধাংশু, হিমকর, হিমাংশু, বসুধা, ধরণী, ইলা, মহী, ক্ষিতি, ভূ, উর্বরা, অবনী, ধরা, ভূমি, পৃথ্বী, কু, বসুন্ধরা, বসুমতী, গো, পৃথিবী, সর্বংসহা, ধরিত্রী, ক্ষ্মা, মেদিনী, অবনি, ভূমণ্ডল, অক্ষর, ঈশ্বর, অদ্রীশ, অদ্রিশ, ব্রহ্ম, ধাতা, বিধাতা, অজ, ধ্রুব, আত্মা, কালেশ, বিধি, বিভু, জগৎপিতা, জগদীশ, ভগবান, পরমেশ, ঈশ, বিশ্বপতি, ব্যোমকেশ, মহাদেব, পিতামহ, পরমেশ্বর, রূপ, নায়ক, আদি, তনু, গুরু, অব্দ, উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রীরাম, রাঘব, ঐরাবত, ত্রিদিব, ইন্দ্রহস্তী,

ইন্দাশ্ব, গজাস্যরদ, শুক্রদৃক্, শুক্রাক্ষি, বিঘ্নেশরদ, নরকায়া, নরগাত্র, কলেবর, উক্‌থা, শ্রীঃ।

২—দ্বিতয়, দ্বি, দ্বৈত, দ্বয়, নদীকূল, যুগ, যুক্, উভ, নদীতীর, পাদ, নরশ্রুতি, নরভুজ, যামল, মিথুন, অসীধারা, রামনন্দন, হোরা, কপোল, নিতম্ব, অয়ন, উরু, রাঘবাত্মজ, বড়বাস্তন, দ্বন্দ্ব, কুটুম্ব, রবিচন্দ্রৌ, জঙ্ঘা, গুল্ফ, ঈক্ষণ, নয়ন, অক্ষি, দৃষ্টি, চক্ষু, লোচন, নেত্র, অশ্বিন, অত্রিদৃক্, অগ্নিচক্ষু, মাদ্রীনন্দন, করীদন্ত, কুঞ্জররদ, দ্বিপদন্ত, নাসত্য, যম, যমল, দস্র, করতল, পদতল, পক্ষ, পাখা, যুগল, জানু, যুগ্ম, বাহু, ওষ্ঠ, কর, কর্ণ, কুচ, ভুজ, ভ্রূ, অনিল, ষণ্ডামর্ক, বারণরদ, মাতঙ্গ, নারীস্তন, কপোল, সরিৎপুলিন, তটিনীতীর, সর্পজিহ্ব, অত্যুক্‌থা, স্ত্রী, নরপাণি, গজদন্ত, হস্তীরদ, প্রবাহিনীতট, বিষ্ণুপত্নী।

৩—ত্রয়, জরাঙ্ঘ্রি, লোক, ত্রি, কর্তৃ, কর্ম্মা, কার্যে, কাল, কুল, বংশত্রয়, কূট, কোন, বর্গ, গর্ত্ত, গুণ, চক্র, নাথ, নেত্র, চক্ষু, লোচন, চীবর, জগৎ, ভুবন, বিষ্টপ, সংসার, জাতক, তত্ত, ঋণ, কর্ম্ম-পাতক, ব্যাধি, দোষ, মদ, যুগ্মগুণ, তন্ত্রী, তাপ, দণ্ড, দিব, দেব, ধামা, ধার, পথ, পলাশবৃক্ষ, পাদ, পাপ, পাতকত্রয়, পারীণ, পিটক, পিটকত্রয়, পুর, পুরাসুর, তারকাসুর, পুরুষ, পুরুষত্রয়, পুষ্কর, বর্ণ, পুষ্করবার, ত্রিফলা, বর্ণক, বর্ত্ম, বলি, বিদ্যা, বেদী, বিৎকরণ, ভূত, বৃৎকরণ, বেণী, মধু, মূর্ত্তি, কালত্রয়, বিষ্ণু, লোকেশ, লোকনাথ, লৌহক, শক্তি, দুর্গা, শিখত্রয়, শিরাত্রয়, শীর্ষক, মুণ্ড, সন্ধ্যা, মর্গ, শিবচক্ষু, শিবলোচন, শিবদৃক্, ত্রিবেদী, রাম, কার্ষিক, ত্রিক্, গণ, কালগ্নি, কালিদাসকাব্য, গায়ত্রী, নারী, রুদ্রাক্ষি, ত্রিতয়, ঈশদৃক্, শূলশিখা, মহীকোণ, মুগ, ঋতু, রত্ন, শরণ, লোকী, ত্র্যক্ষ, ত্র্যক্ষর, প্রণব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়রথ, গ্রীবরেখা, গ্রীবলেখা, ত্রয়ী, সিদ্ধি, স্বর, অর্থ, বিষ্ণুপত্নী, প্রণাম, নমস্কার, নতিকরণ, ত্রিবিক্রমপদার্পণ, সহোদরা, তপনতনয়, বিরুপাক্ষ, শিবাক্ষি, মধ্যা, নারী, মৃগী, অগ্নি, বহ্নি, হুতাশ, হুতাশন, জ্বলন, শিখী, বিষ্ণুরঅঙ্ঘ্রি, কৃশানু, পাবক, বৈশ্বানর, দহন, বহ্নিচরণ, বিশ্বদেব, অগ্নিত্রয়, অগ্নিপাদ, অত্রি, বিভাবসু, সর্বভুক, সর্বশুচি, শুল্মা, শুষ্ক, ভুজি, শুল্ক্যু, গঙ্গা, ত্রিবেণী, তিরপুনি, গঙ্গামার্গ, সুরধুনী, ভাগীরথী, জাহ্নবী, তুষগ্রহ, তুষসার।

৪—বেদ, ব্রহ্মাস্য, অব্ধি, হরিবাহু, স্বর্দন্তিদন্ত, ভদ্র, বিষ্ণুমূর্তি, চতুর্ব্যূহ, অঙ্গ, কর্ম্মযুগ, নারী, বামা, পূর্ণসেন্য, সেনাঙ্গ, উপায়, যাম, যুগ, গোস্তন, অর্ণব, বর্গ, কাল, হস্তপদাদি, গোস্তন, গাভীস্তন, অন্তরিন্দ্রিয়, স্নান, সিন্ধু, রত্নাকর, পুরুষার্থ, পশু, পঞ্চপদ, সমূদ্র, অম্বুধি, উদধি, আশ্রম, রমণী, কৃত, তুর্য, ধাম, বক্ত্র, বর্ণ, কোষ্ঠ, দিশ, দিক্, সাধন, জলনিধি, সাগর, স্তিম্তি, প্রতিষ্ঠা, কন্যা, সতী, অর্থ, পয়োধি, বারিধি, পাথার, জলধি, ব্রহ্মাবক্ত্র, চতুর্মুখ, বিষ্ণুর বাহু, ব্রহ্মানন, সম্প্রদায়, বৃন্দা, শ্রুতি, কাল, ভদ্র, অভিনয়, বৃত্তি, গোত্র।

৫—অনিল, সন্ধি, ভূত, উপাসক, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, কল্যাণ, কষায়, কোল, কোষ, কোষবিদ্যা, গঙ্গা, পঞ্চগঙ্গা, গব্য, শুঁড়ি, গুণ, গৌড়, চূড়ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়, তত্ত্ব, তন্ত্র, তন্মাত্র, তিক্ত, দেবতা, দ্রাবক, দ্রাবিড়, নখ, নদ, নদী, নিম্ব, পক্ষী, নীরাজন, পঞ্চপর্ব, পল্লব, পুষ্প, পাণ্ডব, পাত্র, পিতা, পিত্ত, প্রদীপ, প্রাণ, প্রেত, বট, বক্ত্র, বটী, বন্ধন, বর্ণ, বর্গ, বল্কল, বাণ, বায়ু, কামগুণ, ভদ্র, ম, মহানদী, মহাপাতক, মহাযজ্ঞ, মূত্র, মুদ্রা, রঙ্গ, রত্ন, রাজচিহ্ন, রূপ, লক্ষণ, পুরাণলক্ষণ, লবন, লোকপাল, লৌহ, শস্য, সুগন্ধিক, স্মরণীয়া, পঞ্চায়েত, অগ্নি, অঙ্ক, অঙ্গ, আল, আনন্দ, অপ্সরা, তীর্থ, নারীতীর্থ, অমরা, আয়ুধ, অমৃত, আম্র, অম্ল, কর্মেন্দ্রিয়, উপাচার, সায়ক, ইষু, বিশিখ, বিষয়, অর্থ, কোষ্ঠ, মধ্যশরীর, মহাভূত, কন্যা, পঞ্চবটী, বৃক্ষ, ন্যায়, মহামখ, প্রাণানিল, পঞ্চমূল, শিবাস্য, রুদ্রাস্য, শিবানন, পঞ্চানন, সবরাস্য, সর্বজ্ঞানন, বৃহৎমূল, স্বল্পমূল, তৃণমূল, শতবর্ষাদিমূল, জীবকাদিমূল, বলাদিমূল, গোক্ষুরাদিমূল, গুড়ুচ্যাদিমূল, কণ্টকমূল, শর, সুপ্রতিষ্ঠা, বৃত্তি।

৬—বজ্রকোন, ত্রিশিরোনেত্র, তর্কাঙ্গ, চক্রবর্তী, মহাসেনবদন, গুণ, চক্র, গঙ্গা, ফড়িঙ্, প্রজ্ঞ, গয়া, দুর্গ, শাস্ত্র, শস্ত্র, কর্ম, ভৃঙ্গপাদ, গুহানন, বর্গ, কায়, তর্ক, ঋতু, রস, ফসল, নন্দী, অরি, অঙ্গ, দর্শন, কুমার-আস্য, কায়া, কার্তিকের আনন, রিপু, রাজা, কুসুমলিট্পাদ, শত্রু, ভাব, লবণ, বেদাঙ্গ, গব্য, গোজাত, ধূপ, ষড়ঙ্গক, ষড়্জ, অভিজ্ঞ, ষড়াম্নায়, ভগ, শিবানুচর, গুহবক্ত্র, আধ্যাত্মিকইন্দ্রিয়, বহিরায়তনইন্দ্রিয়, ষট্পদ।

৭—অগ্নি, জিহ্বা, অর্চ্চি, অংশু, তন্ত, বহ্নিশিখা, দীধিতি, জ্বাল, বহ্নি-জিহ্বা, অত্রি, অশ্ব, তুরগ, বাজী, ঘোড়া, ঘোটক, কুরাঙ্গম, হয়, অঙ্গ, রাজ্যাঙ্গ, স্বামী, লোক, ভুবন, স্বর্গ, পাতাল, ভূতল, পরলোক, সমুদ্র, সাগর, অর্ণব, অব্ধি, জলনিধি, উদধি, জলধি, সিন্ধু, স্তিতি, বারিধি, পয়োধি, পাথার, প্যারাবার, রত্নাকর, গঙ্গাধর, সলিলধি, সলিলনিধি, পর্বত, কুলপর্বত, কুলাচল, অগ, অচল, বসুধর, মহীধর, মহী, ভূধর, পৃথ্বীধর, গিরি, ভূভৃৎ, বর্ষপর্বত, কলিন্দ, অব্দ, নগ, অদ্রি, শৈল, নরকাঞ্চী, সপ্তকী, পলাশপর্ণ, ছাতিমচ্ছদ, মুনি, ঋষি, সপ্তর্ষি, ঋষিমণ্ডল, সপ্তক, স্বর, স্বরগ্রাম, স্বরা, গ্রাম, রক্ত, ধাতু, সপ্তি, রথী, দ্বীপ, দ্বীপা, প্রকৃতি, ধী, সপ্তপদী, সাম, দ্বীপপতি, সপ্তাহ, বার, দিন, চিত্রশিখণ্ডী, মাতা, ব্রীহি, চিরজীবী সপ্তাংশু, বৃশ্চিকগ্রন্থি, অস্ত, মহর্ষি, আবরণ, তল, পুরী, বীজ, স্ব।

৮—যোগাঙ্গ, ঈশমূর্তি, ব্রহ্মশ্রুতি, ব্যাকরণ, দিক্‌পাল, কুলাদ্রি, কাল, ধর্ম, ধাতু, জ্বর, দৃষ্টি, নায়িকা, ব্রহ্মশ্রোত্র, পরিষদ, নতি, মহিষী, কুলপর্বত, বামনরূপীবিষ্ণু, গুণ, ব্রহ্মাকর্ণ, দ্রব্য, ক্ষীর, ধৃতি, মঙ্গলঘৃত, অষ্টশ্রবা, অনুষ্টুপ, সিদ্ধি, তক্ষ, দিগ্‌গজ, দ্বিপ, ভূতি, মঙ্গল, সর্প, অহি, বসু, হস্তী, দণ্ডী, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, নাগ, অঙ্গ, গজ, কুলাচল, দিক্, দিকরক্ষক, গজ, ঐশ্বর্য, লূতাপাদ, পাশ, বর্গ, দুর্গাভুজ, অষ্টভুজ, ভৈরব, মূত্র, মূর্ত্তি, লোকধর্ম, লৌহক, লৌহ, সখী, যোগিনী, সাত্ত্বিক, প্রণাম, বজ্র, মৈথুন, অর্ঘ্য, উপাচার, আয়ুর্বেদঅঙ্গ, সেনাঙ্গ, চণ্ডীমূর্তি, তক্ষক, ভোগী, অবয়ব।

৯—অঙ্গদ্বার, ভূখণ্ড, কাতিকরাবণমস্তক, ব্যাঘ্রীস্তন, সুধাকুণ্ড, সেবধি, গ্রহ, সুধাখণ্ড, কৃত্তরাবণমস্তক, গোপ্যখণ্ড, ধান্য, ধেনু, শিলা, ভক্তি, বীর, নন্দ, পবন, গো, অন্ত, অঙ্ক, ছিদ্র, দ্বার, রস, নব, রন্ধ্র, নিধি, নবপত্রিকা, প্রস্থান, বর্ষ, রঙ্গ, রত্ন, লক্ষণ, শক্তি, শায়ক, নবমী, দুর্গা, নট, উপাধ্যায়, পঞ্চমূল, স্থায়ীভাব, দ্রব্য, বৃহতি।

১০—হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু, রাবণমস্তক, কৃষ্ণাবতার, বিশ্বদেব, অবস্থা, ইন্দুবাজী, রাবণমৌলি, স্থাণুবাহু, রাবণানন, চুম্বন, ধর্মপত্নী, ধূপ, উপাচার, হস্তাঙ্গুলি, চন্দ্রবাজী, কলাবাজী, অগ্নিকলা, অগ্নিমূর্ত্তি, নিঘণ্টু, সূত, রূপক, অবতার, ককুপ্, কর্ম্ম, আশা, বিশ্ব, দিক্,

রাবণমুণ্ড, দিশ্, অঙ্গুলী, পংক্তি, দিশা, রাবণশির, দশক, দশকণ্ঠ, রাবণকণ্ঠ, রাবণকন্ধর, রাবণগ্রীবা, রাবণাস্য, কর্মান্বিত, দশা, দিশ্, দিক্‌পাল, নামী, শাখা, পিণ্ড, প্রহরণ, বল, বুদ্ধবল, বাইচণ্ডী, দশভুজা, মহাবিদ্যা, শীল, হরা, অঙ্গধূপ, অশ্বমেধ, অশ্বমেধিক, ক্লেশ, সংস্কার, শিবকর্ণ, শিবনেত্র, দেবযোনি।

১১—মহাদেব, করণ, কুরুভূপতিসেনা, বৃষধ্বজ, ঈশ্বর, ঈশ, ভব, অক্ষৌহিণী, শূলী, ভর্গ, শিব, রুদ্রাক্ষর, ঈশান, হর, রুদ্র, তনু, মূর্তি, গণদেবতা, দ্বার, একাদশ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দেব, ত্রিষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা।

১২—অর্ক, রাশি, সংক্রান্তি, গুহবাহু, কলিন্দ, প্রভাকর, সবিতা, মিহির, অরুণ, অংশুমালী, দিনমণি, তুষিত, সারিকোষ্ঠক, সেনানীনেত্র, ক্ষ্মাপতিমণ্ডল, দিনপ্রণী, সাধ্য, আভাস্বর, জগতী, নভশ্চক্ষু, বিয়ন্মনি, অরুণসারথী, মাস, মার্ত্তণ্ড, ব্যয়, দ্যুমনি, ভানু, ভাস্কর, অম্বরমনি, দিনবন্ধু, দিনপতি, দিনদেব, দিননাথ, দিবাবসু, তপন, কার্তিকের-চক্ষু, সহস্রাংশু, সূর্য, বংশস্থবিলম্, কার্ত্তিকবাহু, কুমারকর্ণ, মহা-সেনকর, আদিত্য, কার্তিকেরকর, রবি, দিবাকর, দিনকর, সূর্যকলা, ভানুরশ্মি, ইন্দ্রিয়, কার্ত্তিকলোচন, আত্মা, দ্বাদশী, যাত্রা, মদ্য, মল, বন, পুত্র, অদিতি, দেবমাতা, সূত, ভগন।

১৩—তাম্বূলগুণ, বীথ্যাঙ্গ, বিশ্ব, কশ্যপকামিনী, সামগাচার্য, প্রতিমুখাঙ্গ, অঘোষ, সত্য, অতিজগতী, বিশ্বদেব, মন্মথ, কাম, ত্রয়োদশ, মঞ্জুহাসিনী, মঞ্জুভাষিণী, রুচিরা, অতিজগতী।

১৪—যম, স্বরাট, ধ্রুবতারকা, অন্বয়, অভিনয়, মৃগ, শক্র, লোক, ভুবন, মনু, ইন্দ্র, বিদ্যা, চতুর্দশ, পুরুষ, চতুর্দশী, যম, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-দেবতা, স্তবেষ্য, শর্করী, বসন্ততিলক।

১৫—সামিধেনী, কান্তাকলা, অহণ্, ঘস্র, দিন, পক্ষ, তিথি, ত্রিপঞ্চ, তূণক, মালিনী, অতিশর্করী।

১৬—ইন্দুকলা, অম্বিকা, গৌরী, নাট্যচেষ্টার উপকারক, ভূপতি, চন্দ্রকলা, অষ্টি, নৃপ, ভূপ, কলা, শশীকলা, সোমকলা, মাতৃকা, কল্পিতমাতা, মাতা, ষোড়শী, অঙ্গধূপ, দান, উপাচার, বিদ্যাদেবী, সরস্বতী, নাড়ী।

১৭—সংস্কার, প্রাজাপত্যপশু, অত্যষ্টি, মন্দাক্রান্তা, সপ্তদশ।

১৮—দ্বীপ, বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি, ধান্য, পীঠ, ধৃতি, পর্ব, উপদ্বীপ, ভারত, উপপুরাণ, গজেন্দ্রলতা।

১৯—দেববাদ্য, অতিধৃতি।

২০—অঙ্গুলি, রাবণনেত্র, রাবণকপোল, রাবণাক্ষি, রাবণকর, রাবণভ্রূ, রাবণভুজ, নখ, কৃতি, রাবণকর্ণ, উপসর্গ।

২১—উৎকৃতি, প্রকৃতি, স্বর্গ, মূর্ছনা, অনুস্মৃতি, সমিৎ, ত্রিসপ্ত।

২২—কৃতী, জাতি।

২৩—বিকৃতি।

২৪—ন্যায়গুণ, কেশব, গায়ত্রী, অর্হৎ, সিদ্ধ, জিন, তত্ত্ব, ভ, দণ্ড, সংস্কৃতি।

২৫—অতিকৃতি।

২৬—উৎকৃতি, বাক্যদোষ।

২৭—উড়ু, উদ, নক্ষত্র, ভ।

২৮—তত্ত্ব, উষ্ণিক্।

৩২—রদ, দন্ত, অনুষ্টুপ।

৩৩—ত্রিদশ, সুর, অমর, দেব, ত্রয়স্ত্রিংশ, নভপতি, গগনপতি।

৪০—নরক, পঙ্‌ক্তি।

৪৩—ন্যায়।

৪৪—ত্রিষ্টুপ্।

৪৮—জগতী।

৪৯—তান, অনিল, বায়ু, উপপাতক, উপপাপ, মরুৎ, মারুত, পবন, মলয়।

৬৪—আভাস্বর, কলা।

১০০—ধার্তরাষ্ট্র, শতভিষক্‌তারকা, দূর্বাগ্রন্থি, পুরুষায়ু, রাবণাঙ্গুলি, অব্জদল, শক্রযজ্ঞ, অশ্বিধযোজন, কুমুদদল, পদ্মদল, ব্রাহ্মণ, শতক্রতু, শতদ্রু।

১000—জাহ্নবীবক্ত্র, শেষশীর্ষ, অম্বুজচ্ছদ, রবিকর, বাণরাজের কর, বেদশাখা, ইন্দ্রদৃষ্টি, কার্তবীর্যার্জুনের কর, ভানুকিরণ, সূর্যরশ্মি, বোয়ালদংষ্ট্র, ইন্দ্রদৃক, ইন্দ্রাক্ষি।

১১ উপসংহার

পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব অপরিসীম। এখনও অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে পরিচয়ের অন্তরালে। হয়তো এর মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এমন কোন মূল্যবান সৃষ্টি যা সাহিত্যে ও ইতিহাসে উন্মোচিত করতে পারে নতুন অধ্যায়, নতুন দিগন্ত। পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন ও শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে আমার চার/পাঁচ বৎসরের স্বল্প অভিজ্ঞতায় দেখেছি সম্পূর্ণ-রূপে অজানার অন্ধকারে বিরাজমান কাব্য, নাটক, প্রহসন, রম্যরচনা, তন্ত্র, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি এমন সব সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে যেগুলি প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে সাহিত্য জগতের গৌরব বৃদ্ধি পাবে। অনেকে মনে করেন একটা পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ অংশ ব্যতীত খণ্ডিত একটি বা দুটি পত্র মূল্যহীন। সাধারণ্যে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু একজন গবেষকের কাছে এটা ভুল ধারণামাত্র। কেবল একটি বা দু'টি পত্রই নয়, একটি পত্রের অর্ধেক এমনকি লিখিত ছোট-খাট টুকরা পত্রও যথেষ্ট মূল্যবান। সেগুলিকেও সম্ভবমত পরিচায়িত করে রাখা কর্তব্য। এই খণ্ডিত পত্রগুলি অনেক সময় কোন মূল্যবান গ্রন্থের বিছিন্ন অংশও হতে পারে। যেমন—'কপিদূত' নামে একটি কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে—যা ছিল সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। এবং দেখা গেছে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর অন্য কোন 'কপি' পৃথিবীর কোথাও নেই। এমনি একটা মূল্যবান পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো কাব্যটির প্রথম পত্রের নয়টি শ্লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে সে স্থলে 'ঘটকর্পর কাব্যের নয়টি শ্লোক সংযুক্ত হয়ে আছে। লিপিকর একই সঙ্গে এই দুটি কাব্য লিপি করতে গিয়ে হয়তো ভুলটি করেছেন। এখন এই 'কপিদূত' কাব্যের প্রথম পত্রটি খণ্ডিত পত্র হিসেবে হয়তো অন্য কোন পাণ্ডুলিপির ভিতর মিশে আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই খণ্ডিত ছোটখাট এক পাতা আধ-পাতার তুচ্ছ পত্রগুলিতে এমন কোন মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে যার মাধ্যমে কোন বিতর্কিত সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকদের সঠিক সময়-বিচার নিয়ে আজ পর্যন্ত গবেষণা

চলছে। অতএব, পাণ্ডুলিপির লিখিত কোন অংশকে কোন প্রকার অবহেলা না করে অতি যত্ন সহকারে যথাসম্ভব পরিচায়িত করে রাখা বাঞ্ছনীয়।

উৎস-নির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢা. বি.) পুথি সংখ্যা—২২২২
২ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২২০৯
৩ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২১৯৫
৪ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২২৩৩
৫ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২২০৬
৬ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—১৯৭৮
৭ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা—২২১০
৮ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা—১৯৭৮
৯ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৪৯৫
১০ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৪৬০৮
১১ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৭৫২
১২ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. সংগ্রহ শালার পত্র সংখ্যা—৮৫
১৩ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্য—৩৯৬
১৪ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২৫৯৮
১৫ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা—১৯৮৮
১৬ দ্রষ্টব্য রামমালা পুথি সংখ্যা—১৯৯
১৭ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা—১৯৮৮
১৮ দ্রষ্টব্য রামমালা পুথি সংখ্যা—৫৭৩৫
১৯ দ্রষ্টব্য রামমালা পুথি সংখ্যা—১৯২
২০ দ্রষ্টব্য রামমালা পুথি সংখ্যা—২০২
২১ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা—২০৯৭
২২ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০৮৫
২৩ দ্রষ্টব্য ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০২৩; কাব্য চন্দ্রিকা
২৪ সাত সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু সুরা, সর্পি(ঘৃত), দধি, দুগ্ধ, জল।
২৫ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০৩৬; গীতামাহাত্ম্যম্।
২৬ ছ'টি রস—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত।

২৭ দ্র. ঢা. বি. সংখ্যা—২৫৯৮

২৮ বেদের চারটি বিভাগ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব।

২৯ কুসুম লিট্পাদ—'কুসুমলিট্' শব্দের অর্থ ভ্রমর বা মৌমাছি। 'পাদ' অর্থ পা। ভ্রমর বা মৌমাছির ছয় পা।

৩০ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২৯০৫৬

৩১ পঞ্চবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন।

৩২ সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন প্রখ্যাত ঋষি।

৩৩ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২৯০০৮

৩৪ দ্র. রামমালা পুথি সংখ্যা—১১৬৫

৩৫ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০৮৫

৩৬ সপ্তি—যে সাতটি অশ্ব সূর্য দেবতার রথ টানে বলে কথিত আছে, সপ্তি বলতে এখানে সেই সাতটি অশ্বকে বোঝানো হয়েছে।

৩৭ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০১৩০

৩৮ ইন্দ্র—মত ভেদে ইন্দ্র চতুর্দশ।

৩৯ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা ৩০১৩৬

৪০ পর্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র এই সাতটি পর্বত পুরাণে খ্যাত।

৪১ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২৯০৭৫

৪২ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—২৯০৭২

৪৩ পঞ্চাগ্নি—দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, পবন, পাবন।

৪৪ দ্র. রামমালা পুথি সংখ্যা ১০৮০

৪৫ অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ।

৪৬ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০২৩

৪৭ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০২৩

৪৮ দ্র. ঢা. বি. পুথি সংখ্যা—৩০০৩৬।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ।

২ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, মে, ১৯৮৬

৩ কেশবমিশ্র, অলঙ্কার শেখর : সম্পা—অনন্তরাম শাস্ত্রীবেতাল, বারানসী ১৯২৭

৪ শ্রীকৃষ্ণকবি, মন্দারমরন্দচম্পূঃ, সম্পা—পণ্ডিত কেদার নাথ ও বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পন্‌সীকার, নির্ণয় সাগর, ১৯২৪।

৫ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৮২

৬ দেবেশ্বর, কবিকল্পলতা, সম্পা—পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন, কলিকাতা, ১৯০০

৭ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাথমিক জ্যোতিষতত্ত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা, কার্ত্তিক, ১৩৪৩

৮ পঞ্চানন মণ্ডল, পুথি পরিচয়, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৫৮

৯ ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

১০ ড. যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৫

১১ মহামহোপাধ্যায় শ্রী শ্রীনিবাস, শুদ্ধি-দীপিকা, সম্পা—শ্রী নীলকমল বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ, ১৩৩৪

১২ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৭০

সংকেত : ঢা. বি. পা. সং. সংখ্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংযোজন সংখ্যা)।

ঢা. বি. পু. সংখ্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংখ্যা)।

রা. পু. সংখ্যা (রামমালা পুথি সংখ্যা)।

ঢা. বি. পা. গ্র. সং. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি শাখার গ্রন্থ সংখ্যা)।